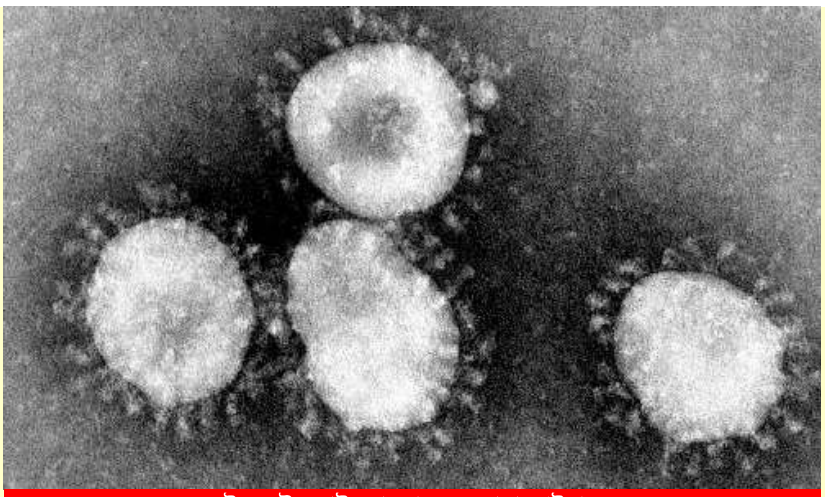

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে করোনা ভাইরাস

Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

দশম বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖মার্চ ২০২০

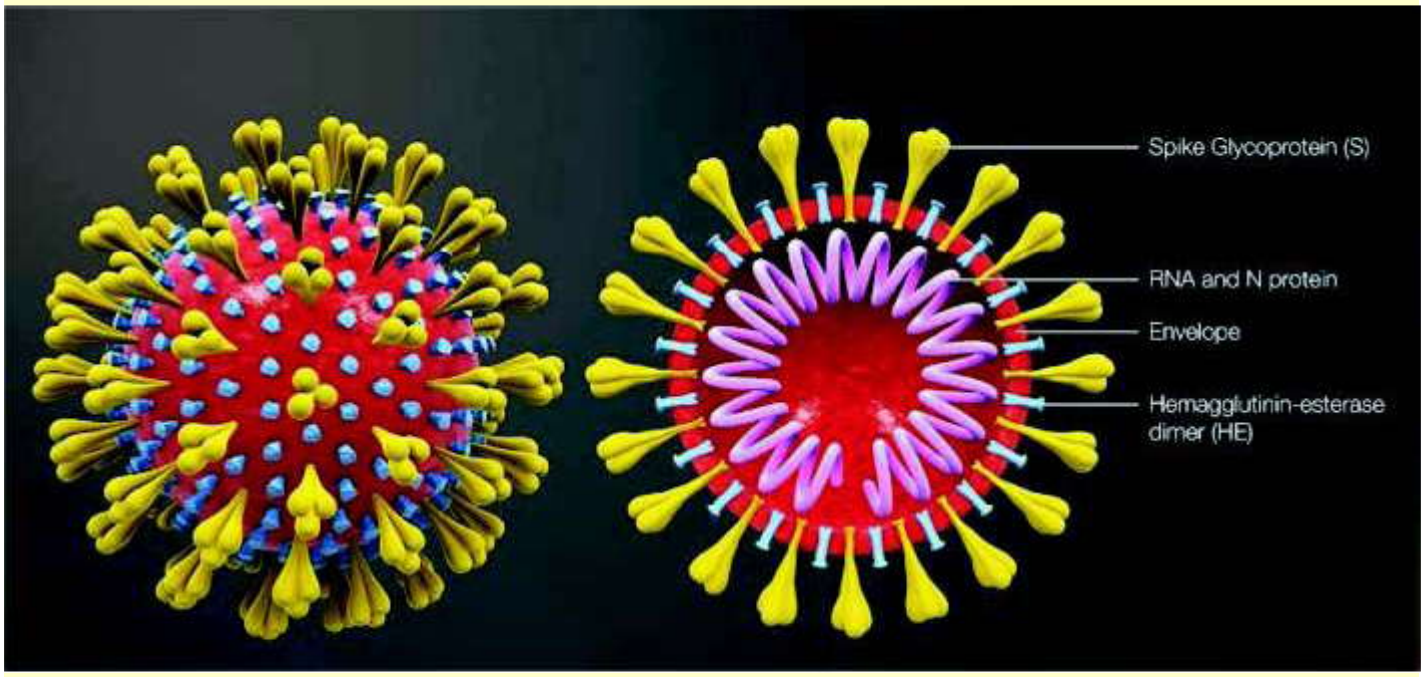

সম্পাদকীয় ঃ

অতি মহামারির প্রতিরোধ কোন পথে ?

বিশেষ রচনা ঃ

নতুন করোনা ভাইরাস কি জীবাণু অস্ত্র ?

প্রশ্ন ও উত্তরে ঃ

ভাইরাস এবং নতুন করোনা ভাইরাস

ঃ সূচিপত্র ঃ

সম্পাদকীয় ঃ	**২**
চিঠিপত্র ঃ	**৩**
প্রশ্ন ও উত্তরে ঃ **ভাইরাস এবং নতুন করোনা ভাইরাস**	**৪**
বিশেষ রচনা ঃ **নতুন করোনা ভাইরাস কি জীবাণু অস্ত্র ?**	**৯**
বিজ্ঞানের বিশেষ খরব ঃ **১০৭তম বিজ্ঞান কংগ্রেস**	**১৩**
চিঠির জবাব ঃ **জলসংকট বিষয়ে সমীক্ষণ সম্পাদকমন্ডলীর জবাব**	**১৪**
পাঠকের কলাম ঃ **পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত**	**২০**
বিজ্ঞানের খবর ঃ	**২৩**
সমাজ দর্পণ ঃ	**২৪-২৬**
ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ **মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ**	**২৭**
চয়ন ঃ **গোমূত্র এবং গোবর কি সর্বরোগহরা ?**	**৩২**
সংগঠন সংবাদ ঃ	**৩৪**

সম্পাদকীয় ঃ

অতি মহামারির প্রতিরোধ কোন পথে ?

এই নিবন্ধ যখন লেখা হচ্ছে (২১শে মার্চ ২০২০) তখন দেশের জীবাণু সংক্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে আমরা এই সংক্রমণের দ্বিতীয় ধাপে অবস্থান করছি। জীবাণু সংক্রমণ বিশেষজ্ঞ শ্রী ওম শ্রীবাস্তব বলেছেন "আমরা এই মহামারির ক্ষেত্রে এখন দ্বিতীয় ধাপে রয়েছি যেখানে সংক্রমণ এখনও আঞ্চলিক সীমায় রয়েছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে এটা তৃতীয় ধাপে না পৌঁছায়, যাকে বলা হয় কম্যুনিটি সংক্রমণ (অর্থাৎ এক একটা জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলের মধ্যে সংক্রমণ)।"

ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সাম্প্রতিকালের গতিবিধি দেখে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এদেশে সংক্রমণ হচ্ছে বিদেশ থেকে আসা মানুষজনের মাধ্যমে। পৃথিবীর সব মহাদেশের সকল দেশের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। চিনের উহান শহর থেকেই সারা বিশ্বে এটা ছড়িয়েছে। ইতালিতে এই মহামারিতে মৃত্যুর সংখ্যা উৎপত্তিস্থল চিনকে ছাপিয়ে গেছে। ইরান, স্পেন, সংযুক্ত রাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বত্রই এর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ২১শে মার্চ ২০২০ অবধি মহামারিতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার, আক্রান্ত প্রায় ৩ লক্ষ। সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বিদেশ থেকে আসা এবং দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো মানুষদের মাধ্যমে। যদিও অন্তত ডিসেম্বর-এর শুরু থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির বিষয় সচেতন ছিল।

ভারতে গত ১৮ই জানুয়ারি থেকে মুম্বই বিমান বন্দরে স্ক্রিনিং চালু হয়েছে। তার আগেই নভেল করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স প্রকাশিত হয়েছে, চিন থেকে এই মহামারি বিশ্বের অন্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুসারে ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা এদেশে ঢুকেছেন ১লা মার্চ ২০২০, সকাল ৪টা ৩০ মিনিটে। সেই সময় আবুধাবি থেকে মুম্বাই-এর ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে একটি বিমান অবতরণ করে। এই বিমানে বিভিন্ন দেশ থেকে মহারাষ্ট্রের পুণা, আহমেদনগর, নাগপুর এবং কর্ণাটকের বেলগাঁও এর বাসিন্দারা এদেশে আসেন। বিশেষজ্ঞদের অনুমান এরাই এদেশে নভেল করোনা ভাইরাস প্রথম আমদানি করেছে। এদের সেদিন কোয়ারেন্টাইনে রাখলে বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হত কী? পরবর্তীকালে সংবাদে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এই রাজ্যের এক আমলার পুত্র কিংবা বলিউডের গাইকা কনিকা কাপুরের

চিঠিপত্র ঃ

সাথী, সম্পাদক

আমি সমীক্ষণের নিয়মিত পাঠক, আমার সমীক্ষণ পড়তে ভালো লাগে। তবে পরপর কয়েকটি সংখ্যায় দেখছি মূল বিজ্ঞানের বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে পত্রিকায় উল্লেখ পাচ্ছে না। যে লেখাগুলি আসছে সামাজিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে বিগত সংখ্যাগুলো যেমন বিজ্ঞানীদের জীবনী, গ্রহদের আকাশ এবং গ্রহদের নানান বিষয় সম্পর্কে এবং পরমাণু সংক্রান্ত মূল বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখা আমার এবং আমার সহপাঠির ভালো লেগেছে। যদি সামাজিক বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মূল বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সম্পর্কে লেখা হয় তবে আরও ভালো হবে আমার মনে হয়। বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয় যেগুলি আজও বহু মানুষের কাছে অজানা, সেই বিষয়গুলি যেন পত্রিকায় উল্লেখ থাকে। সেই কারণে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রোহিত প্রামাণিক
আশুতি, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

এই সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠির উত্তর ঃ

সাথী রোহিত,

তোমার সমীক্ষণ সম্পর্কে মতামত আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। তোমাদের যে যে বিষয় বিশেষ জানার আগ্রহ রয়েছে, সে বিষয়গুলি নিয়ে আগামী দিনে লেখা প্রকাশ করার বিষয় আমরা যত্নবান হব। তবে তোমাদের বলি, বিগত সংখ্যায় আমরা বিজ্ঞানী মেন্ডেলের জীবনী প্রকাশ করেছি। মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়েও প্রবন্ধ 'লালগ্রহে অভিযান ও অ্যালিসা কার্জন' প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি জীবনের জলছবি, সমাজ দর্পণ ইত্যাদি ও বিশেষ রচনা প্রকাশিত হয়েছে সামাজিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরে। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ এখনো কোথায় পরে আছে, এই বৈপরীত্ব তুলে ধরতেই আমরা এই ধরনের সামাজিক বিষয় নির্বাচন করি। আর বিগত সংখ্যায় বিশেষ রচনাগুলি সামাজিক বিষয় হলেও, প্রতি ক্ষেত্রে আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস রেখেছি। – সম্পাদক, সমীক্ষণ

সম্পাদকীয়'র শেষাংশ

দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণকে প্রশ্রয় দিয়েছে কারা? সরকার তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী এখন বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের হোম কোয়রানটাইনে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। গত সাড়ে তিন মাসে লক্ষাধিক মানুষ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছেন, অথচ সংক্রমণের পরীক্ষা হয়েছে মাত্র ১৪ হাজার মানুষের। প্রধানমন্ত্রী ২২শে মার্চ সকলকে সারাদিন বাড়িতে থেকে দেশের সমস্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মীদের থালা বাজিয়ে, ঘন্টা বাজিয়ে অভিনন্দিত করতে বলেছেন। রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর ও গঞ্জে লকডাউন করা হবে ২৭শে মার্চ অবধি।

দেশের দায়িত্বশীল চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, বিজ্ঞানী, সাফাই কর্মী সহ যারা অতি বিপজ্জনক মহামারির মোকাবিলায় নেমেছেন দেশের মানুষ তাদের অবশ্যই অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং জানাবেন। কিন্তু এই কর্মী-বাহিনী যে যুদ্ধে নেমেছেন তাদের লড়াই করার অস্ত্র কোথায়? এদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ N95 মাস্ক, অনুমোদিত গ্লাভস, সার্জিকাল ক্যাপ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার কোথায়? এঁরা আক্রান্ত হলে আপামর দেশবাসীকে কে বাঁচাবে? চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী-ডাক্তারসহ সকলেই জানেন ভারত সহ বিশ্বের প্রায় কোন দেশেই এই অবস্থা মোকাবিলার কোন ব্যবস্থা নেই। ভারতের অবস্থা আরও ভয়াবহ।

দেশের সকলকে হোম কোয়ারানটাইনে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার আগে রাষ্ট্রনেতারা কি ভেবে দেখেছেন বাসস্থানহীন, ঝুপড়ি বস্তিতে থাকা দেশের অধিকাংশ মানুষ কেমন হোম কোয়রানটাইনে যাবেন? অতিমহামারি মোকাবিলায় ১৩০ কোটি জনতাকে যদি সমস্ত কাজ ফেলে ঘরে বসে থাকতে হয় তবে তারা খাবে কী?

বিজ্ঞান মনস্ক জনতার তাই আজকের সময়ের দাবি –

* সমস্ত ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মী এবং অতি মহামারির বিরুদ্ধে সংগ্রামরতদের যথেষ্ট পরিমাণে N95 মাস্ক, বিজ্ঞানসম্মত গ্লাভস, সার্জিকাল ক্যাপ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

* চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অতি মহামারি মোকাবিলার উপযুক্ত করতে ডাক্তারি ছাত্র, প্রশিক্ষণে থাকা ডাক্তারদের অবিলম্বে সরকারি কাজে নিতে হবে।

* কম্যুনিটি সংক্রমণ ঠেকাতে সমগ্র দেশবাসীকে উপযুক্ত পরিবেশে অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য কোয়ারানটাইনে পাঠানো হোক, লকডাউন করা হোক – কিন্তু সকলের জন্য বিনামূল্যে সুষম খাদ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহের দায়িত্ব সরকার নিক।

* কোয়ারানটাইনে থাকা জনগণের নিয়মিত সংক্রমণের পরীক্ষা চালাতে হবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সংক্রমণ পরীক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত কোয়ারানটাইন ব্যবস্থা গড়তে হবে।

* অবিলম্বে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াতে হবে।

এই দাবিগুলি পূরণ হলে তবেই এই অতি মহামারি ঠেকানো সম্ভব। অতএব বিজ্ঞান মনস্ক, সমাজ সচেতন জনগণকে এই দাবিতে সোচ্চার হওয়াই আজকের সময়ের দাবি।■

প্রশ্ন ও উত্তরে ভাইরাস এবং নতুন করোনা ভাইরাস

১. ভাইরাস কী?

উত্তর ঃ ভাইরাস হল জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী একপ্রকার অকোষীয় বস্তু যা কেবল পোষক কোষের মধ্যেই বংশবিস্তারে সক্ষম।

২. জড় ও জীবের মধ্যবর্তী বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ কোন বস্তুতে জীবনের অস্তিত্ব থাকলেই তা জীবিত, আর তা না থাকলেই তা নির্জীব বা জড়। জীবিত বস্তুর একটি ক্ষুদ্রতম একক যদি হয় কোষ তবে ঐ কোষ যে যে কাজগুলি তার অভ্যন্তরস্থ উপাদানগুলিকে দিয়ে সংঘবদ্ধরূপে এবং স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে করে থাকে, বাইরের জগতের সাথে সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, তাই এক কথায় জীবন। এছাড়া সজীব বস্তু উপযুক্ত পরিবেশে নিজের প্রতিলিপি গঠনে সক্ষম যা জড় বস্তু পারে না। এককোষী জীবের এমনই বৈশিষ্ট্য। আর বহুকোষী জীবের জীবনের অর্থ তাতে বিদ্যমান বিভিন্ন কলা (কার্যগত ও গঠনগত অথবা উভয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোষ সমষ্টি)র অন্তর্গত বিভিন্ন কোষের পারস্পরিক সংঘবদ্ধ ও স্বনিয়ন্ত্রিত যৌথ কর্মকান্ড। নির্জীব বা জড় পদার্থের অভ্যন্তরে এই কর্মকান্ড দেখা যায় না। তাহলে জড় ও জীবের মধ্যবর্তী কথার অর্থ কী?

বহুকোষী প্রাণীর উন্নত কোষ (ইউক্যারিওটিক) আদিম এককোষী জীব কোষ (প্রোক্যারিওটিক) থেকে ভিন্ন। উন্নত কোষে যত উপাদান (যেমন লাইসোজোম, মাইটোকনড্রিয়া, নিউক্লিয়াসের উপাাদন, গলগি বডি ইত্যাদি) এককোষী জীবে থাকে না ফলে কোষগুলির কাজের অনেক ফারাক থাকে। ভাইরাসের মধ্যে থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ অথবা আরএনএ) এবং তাকে ঘিরে থাকে জটিল প্রোটিন, লিপিড অণু। ব্যাকটেরিয়াও এককোষী জীব এবং তার কোষে নিউক্লিক অ্যাসিড ছাড়াও কোষপ্রাচীর, কোষপর্দা, রাইবোজোম, সাইটোপ্লাজম থাকে। ব্যাকটেরিয়ার কোষের কাজ বহুকোষী জীবের কোষের ন্যায় জটিল নয়, তবে ভাইরাসের তুলনায় জটিল। ব্যাকটেরিয়ার মত এককোষী বা অন্য বহুকোষী জীবের কোষের ন্যায় তাই সংঘবদ্ধ ও স্বনিয়ন্ত্রিতভাবে একটি ভাইরাস স্বাধীনভাবে জীবিত অবস্থায় থাকতে অক্ষম। অন্য কোন এককোষী বা বহুকোষী জীবের কোষকে পোষক হিসাবে ব্যবহার না করে ভাইরাস জীবিত থাকার অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না। এই বিষয়টা আশ্চর্যজনক মনে হলেও আধুনিক জীব বিদ্যায় বিষয়টি প্রমাণিত সত্য। ভাইরাসের এই দ্বৈত অবস্থা – জড়

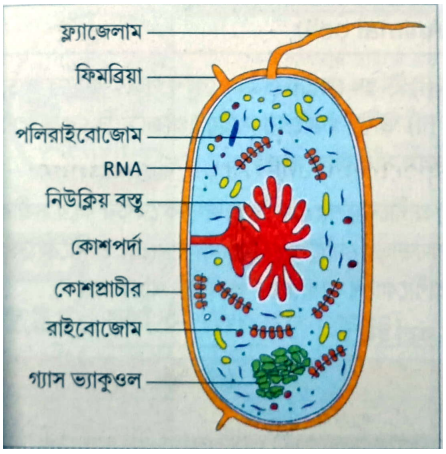

প্রোক্যারিওটিক কোষ

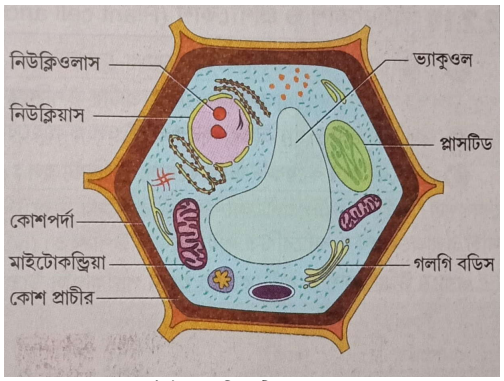

ইউক্যারিওটিক কোষ

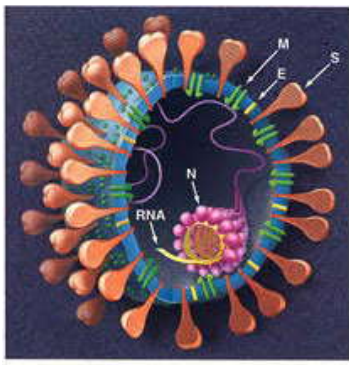

Coronavirus organization. A model of the coronavirus structure showing the organization of the spike (S), membrane (M), and envelope (E) glycoproteins. The RNA is protected by a helical capsid of N protein monomers.

করোনা ভাইরাস

থেকে জীবের উৎপত্তির বিষয়ে ওপারিন ও হ্যালডেনের তত্ত্ব এবং ইউরেমিলারের পরীক্ষাগারে পরীক্ষার ফলাফলের প্রাকৃতিক উপমা মাত্র।

৩. ভাইরাস কি কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ?

উত্তর ঃ আমরা সকলেই জানি আমাদের রোগব্যাধির জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস দায়ী। তাই ভাইরাস প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের জন্য খুব খারাপ। আবার প্রচারের ফলে এই ধারণাও আমাদের অনেকের আছে যে কেমিক্যাল বা রাসায়নিক খুব খারাপ জিনিস। ফসলে বা খাদ্যে কেমিক্যাল থাকলে খারাপ তাই তাকে বর্জন করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের শেখায় এই মহাবিশ্বে যত জড় এবং জীবিত পদার্থ আছে তা সবই কেমিক্যাল বা রাসায়নিক দিয়ে তৈরি। কতগুলি মৌল, তাদের দ্বারা গঠিত যৌগ বা মিশ্র পদার্থ দিয়ে তৈরি। জল, হাওয়া, মাটি, জীবিত সবকিছু, পাহাড়-পর্বত সবই রাসায়নিক দ্বারা তৈরি। ভাইরাসও তাই বিশেষ কয়েকপ্রকার রাসায়নিক দ্বারা তৈরি। কিন্তু পটাশিয়াম সায়ানাইড বা ফসজেন গ্যাসের মত মারণ রাসায়নিক তা নয়। নিছক রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা অন্য জীবাণুর দ্বারা প্রাণী জগতের ক্ষতি হয় না। বহু ভাইরাস মানুষ বা অন্য জীবিত পোষকের দেহে জীবিত হয়ে উঠে বংশবিস্তার করে দেহকোষের ক্ষতি করে। তাই এর ফলে অসুখ বিসুখ এমনকি মৃত্যুও ঘটে পোষকের।

পোষক নির্বিশেষে ভাইরাসের প্রতিলিপি গঠন হয় না। যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী বাদুরের শরীরে মারাত্মক ধরনের ভাইরাস থাকলেও সে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে। এই কারণে বাদুরের মতো কয়েকটি প্রাণীকে (পোষক) ভাইরাসের হারবার বা আশ্রয়স্থল বলা হয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে বাদুরের শরীরের কোষে (এনএলআরপি-৩) নামক একপ্রকার প্রোটিন কম থাকায় ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে বাদুরের প্রতিরোধী কোষের প্রদাহ ভীষণরকম কম থাকে এবং ভাইরাসগুলির আরএনএ-র প্রতিলিপি গঠনে বাধার সৃষ্টি হয়।

অন্যান্য প্রাণী (মানুষ, গরু, ভেড়া, ইঁদুর – পোষকের) শরীরের কোষে এই প্রোটিনের মাত্রা বেশি থাকায় বহু ভাইরাসের প্রতিলিপি গঠন হয় দ্রুত হারে।

৪. ভাইরাসের অস্তিত্ব কিভাবে বোঝা যায় ?

উত্তর ঃ একটি ভাইরাস একটি ধূলিকণার চেয়ে এমনকি এককোষী ব্যাকটেরিয়ার একশ ভাগের একভাগ আকারের হয়। এতই ক্ষুদ্র তার আকার যে ইলেক্ট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাকে দেখা যায় না। ভাইরাস পোষকের দেহে বাসা বাঁধার কিছুকাল পর তার সংক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়। পোষকের শরীরে এইসব লক্ষণগুলি দেখেই আমরা ওই জীবদেহে ভাইরাসের অস্তিত্ব টের পাই।

৫. ভাইরাস পোষকের দেহে কিভাবে জীবিত হয়ে ওঠে ?

উত্তর ঃ কোন একটি পোষকের দেহে প্রবেশ করার পর সেই ভাইরাস অনেক দিন এমনকি কয়েক মাস ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। ভাইরাসের দেহের নিউক্লিক অ্যাসিড পোষকের কোষ উপাদানের সহায়তায় তাকে জীবিত করে তোলে জটিল জৈব রাসায়িক প্রক্রিয়ায়। তখন ওই ভাইরাস প্রতিলিপি গঠনের মাধ্যমে আরও অনেক নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করে বংশবিস্তার করতে থাকে।

৬. ইনকিউবেশন পিরিয়ড কী ?

উত্তর ঃ ইনকিউবেশন পিরিয়ড হল একটি সময়কাল। একটি ভাইরাসের ক্ষেত্রে পোষকের দেহকোষে প্রবেশ করা থেকে সংক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কাল হল ইনকিউবেশন পিরিয়ড। এই ইনকিউবেশন পিরিয়ড ভাইরাস ও পোষকভেদে নিম্নলিখিত কারণে পাল্টায় –

১) পোষকের সংবেদনশীলতা এবং তাদের ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

২) কি হারে ভাইরাসটি প্রতিলিপি গঠন শুরু করে

৩) কি মাত্রায় পোষকে ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে

৪) কোন পথে (route) সংক্রমণ হয়েছে – তার উপর।

৭. মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাইরাসের ইউকিউবেশন পিরিয়ড কী কী ?

উত্তর ঃ ভাইরাস ভেদে ইউকিউবেশন পিরিয়ড

(পোষক – মানুষ)

ভাইরাল অসুখের নাম	ইনকিউবেশন পিরিয়ড
ইনফ্লুয়েঞ্জা	১-২ দিন
কমন কোল্ড	১-৩ দিন
ব্রনকিওলাইটিস	৩-৫ দিন
ডেঙ্গু	৫-৮ দিন
হারপিস সিমপ্লেক্স	৫-৮ দিন
এনটেরোভাইরাস ডিজিস	৬-১২ দিন
মিসলস্ (হাম)	৯-১২ দিন
স্মলপক্স	১২-১৪ দিন
চিকেন পক্স	১৩-১৭ দিন
সোয়াইন ফ্লু	৫-৭ দিন
মামস্	১৬-২০ দিন
সার্স	২-৭ দিন
রুবেল্লা	১৭-২০ দিন

হেপাটাইটিস A	১৫-৪০ দিন
হেপাটাইটিস B এবং C	৫০-১৫০ দিন
রেবিস	৩০-১০০ দিন
এইডস্	১ দিন - ১০ বছর
ইবোলা ভাইরাস	২-২১ দিন
জিকা ভাইরাস	৩-১২ দিন
নভেল করোনা ভাইরাস	২-১৪ দিন

প্রত্যেক মানুষের সহনশীলতা, প্রতিরোধ ক্ষমতা আলাদা হওয়ায় এবং সংক্রমণের মাত্রা এবং কোন পথে সংক্রমণ হয়েছে তার উপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মানুষের ইনকিউবেশন পিরিয়ড বিভিন্ন।

৮. ভাইরাস সংক্রমণ বড় আকারে হলে একটি জনগোষ্ঠীকে বর্হিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় কেন ?

উত্তর ঃ ইনকিউবেশন পিরিয়ড কালীন সময়ে অসুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। তাই সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে বা দেখা না দিলেও যদি ঐ মানুষেরা এই রোগে আক্রান্তের সংলগ্ন থেকে থাকেন তবে এই মানুষদের অন্য মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা জরুরি হয় সংক্রমণ ঠেকাতে। একে কোয়ারেন্টাইন করা বলা হয়।

৯. ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে সকলের মাস্ক পরা জরুরী কী?

উত্তর ঃ প্রথমত ভাইরাস অতিক্ষুদ্র আণুবিক্ষনিক পদার্থ। তাই সাধারণ মাস্কের সাহায্যে ধূলাবালি আটকানো যেতে পারে, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ নয়। বিজ্ঞানীদের মতে ভাইরাসে সংক্রামিত রোগী এবং তার চিকিৎসক – চিকিৎসাকর্মী-সাফাইকর্মীদের অবশ্যই বিশেষ ধরনের মাস্ক, বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন। যদিও একবার ব্যবহার করে তাকে ডিসপোজ (সঠিক ভাবে নষ্ট করে ফেলা) করতে হবে। একাধিকবার ব্যবহার করার অর্থ সংক্রমণকে ছড়িয়ে দেওয়া। সাধারণ মানুষ যেভাবে প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাস্ক ব্যবহার করছেন তা কখনোই বিজ্ঞান সম্মত নয়।

১০. ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া কতটা যুক্তি সঙ্গত ?

উত্তর ঃ আমাদের হাতে থাকা ময়লার মধ্যে থাকে অসংখ্য ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া। শুধু জল দিয়ে হাত ধোয়া হলে এই জীবাণুর সংখ্যা কমে, কিন্তু আমাদের হাত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হয় না। তাই হাত ধোয়ার সময় সাবানের ব্যবহার জীবাণু দূরীকরণে অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকরি হয়।

ভাইরাস, যেমন করোনা ভাইরাস, ইনফ্লুয়েনজা ভাইরাস, ইবোলা, জিকা ভাইরাস ইত্যাদির জেনেটিক বস্তু (নিউক্লিক অ্যাসিড) লিপিড আবরণের অভ্যন্তরে থাকে। সাবানের অণুগুলি 'পিন' আকৃতির চেহারার, যার মাথাটা হাইড্রোফিলিক (অর্থাৎ জলের সাথে সংবেদনশীল) এবং লেজটা ওলিওফিলিক (অর্থাৎ তেলের সাথে সংবেদনশীল)। তেল সংবেদনশীল হওয়ার কারণে সাবানের অণুর লেজগুলি ভাইরাসের লিপিড আবরণের দ্বারা সংযুক্ত হয় ও তার সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। ওলিওফিলিক লেজটি লিপিড আবরণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার crowbar [অর্থাৎ শাবলের মত] প্রতিক্রিয়া ভাইরাসের লিপিড আবরণ ভেঙে দেয়। লেজটি লিপিডের সাথে আরএনএ-র জৈব রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে দেয়। ফলে ভাইরাস অণুটি ভেঙে যায় এবং তারপর জল দ্বারা তা ধুয়ে বেরিয়ে যায়।

১১. অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিভাবে করোনা ভাইরাসের উপর কাজ করে ?

উত্তর ঃ সাবানের মত, হ্যান্ড স্যানিটাইজারে উপস্থিত ইথাইল অ্যালকোহলে ভাইরাসের লিপিড আবরণ দ্রবীভূত হয়। ফলে ভাইরাসের ক্রিয়াশীলতা রুখে দেওয়া যায়। এছাড়া লিপিড আবরণের গায়ে থাকা মাশরুম আকৃতির প্রোটিনের পরিবর্তন ঘটায়।এই মাশরুম আকৃতির প্রোটিন স্ট্রাকচারের জন্য ভাইরাস মানুষের শরীরের কোষের সাথে আটকে যায় এবং তারপর ভাইরাসটি কোষে প্রবেশ করে। অপেক্ষাকৃত কার্যকরী স্যানিটাইজারে অন্তত ৬০ শতাংশ ইথাইল অ্যালকোহল থাকা প্রয়োজন।

১২. গোমুত্র সেবন কী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকায় ?

উত্তর ঃ সম্প্রতি কয়েকটি ধর্মীয় সংগঠন এবং হিন্দুত্ববাদী নেতারা গোমুত্রকে করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহারের সংগঠিত প্রচার চালাচ্ছে। এক লিটার পরিশ্রুত গোমুত্র ৫০০ টাকা দরেও বিক্রি হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও পরিশুদ্ধ গোমুত্রের অন্যতম বিপননকারী রামদেব বাবা পরিস্থিতির চাপে জানিয়েছেন যে গোমুত্র সেবনে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক গুণ প্রমাণিত হয় নি। যদিও তাঁর বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তা প্রমাণিত হবে।

অন্যদিকে সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, গোমুত্র সেবন করে এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তিনি অন্যদের এই ভুল না করার পরামর্শ দিয়েছেন। 'গোমুত্র সর্বরোগহরা' – এই প্রচার দীর্ঘকালের। গোমুত্র, গোবর ছদ্মবিজ্ঞানের মোড়োকে বর্তমানে বিরাট আকারে ব্যবসায়ীক পণ্য।

২০১৫-র জুন সংখ্যায় 'গোমুত্র কী সর্বরোগহরা ...' – এই নিবন্ধটির অংশ বিশেষ তাই পুর্ণমুদ্রন করা হল।

গোমূত্র পান করে অসুস্থ রোগীর ছবি

১৩. ভাইরাস সংক্রমণকালে চিকিৎসা কী ?

উত্তর ঃ ভাইরাস ইনকিউবেশন পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর পোষক কোষকে আক্রমণ করে। বিভিন্ন ভাইরাসের চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন সংক্রমণ দেখা যায়। একে রোখার মত কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত আবিস্কার হয়নি। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এবং নানা গণমাধ্যমে ভাইরাসের ওষুধ নিয়ে নানা প্রচার চলে আসছে। ভাইরাস যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবকোষ নয়, পোষকের দেহকোষে তার জৈবসত্তা প্রকাশ পায়। তাই পোষকের দেহ ত্যাগ করলে তা জড় পদার্থ তাই একে শরীরের বাইরেও খতম করা সম্ভব নয়। আবার পোষকের দেহে ভাইরাসকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করলে পোষক কোষের ক্ষতি হয়ে শরীরে সমস্যা বাড়ে। এটাই সমস্যা।

ভাইরাস পোষকের শরীরে বাসা বেঁধে পোষককে দুর্বল করে দিলে ব্যাকটেরিয়া সহ নানা জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। তখন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করে সেই ব্যাকটেরিয়াজাত সংক্রমণ (Sesondary infection) রোখার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু ভাইরাস মারার কোন ওষুধ নেই।

অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ বলে পরিচিত ওষুধ ভাইরাস সংক্রমণের ইনকিউবেশন পিরিয়ডকে দীর্ঘায়িত করতে পারে মাত্র। এইডস্ এর চিকিৎসায় এমন ওষুধ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইনকিউবেশন পিরিয়ড শেষ হলে তা আর কার্যকরী থাকে না।

ভাইরাস সংক্রমণের সময় বিশ্রাম, পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাদ্যগ্রহণ অন্য শারীরিক সমস্যা যাতে না বাড়ে তার চিকিৎসা নেওয়া জরুরি।

১৪. নতুন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ কী ?

উত্তর ঃ নতুন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের উপসর্গগুলি হচ্ছে ঃ সর্দি, কাশি, হাঁচি, নাকের উপর লাল হয়ে যাওয়া, গলা ব্যাথা, মাথা ধরা, জ্বর, তীব্র শ্বাসকষ্ট, কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং অবশেষে অন্যান্য অঙ্গের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে মৃত্যু। এই রোগেটি একপ্রকার ভাইরাল নিউমোনিয়া। একে উহান নিউমোনিয়া বলা হচ্ছে। আক্রান্ত মানুষ থেকে সুস্থ মানুষদের দেহে সংক্রমণ ঘটে হাঁচি, কাশির সময় বাতাসের মাধ্যমে, স্পর্শের মাধ্যমে, ভাইরাস আছে এমন জায়গায় হাত দিলে এবং সেই হাত মুখ, নাক, চোখে দিলে। মানব শরীরে প্রবেশ করার ২-১৪ দিনের মধ্যে রোগের উপসর্গ দেখা যায়।

১৫. ভাইরাসের ভ্যাকসিন বা টীকা কিভাবে কাজ করে ?

উত্তর ঃ ভ্যাকসিন বা টীকাকরণ পদ্ধতি হল শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করা যাতে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ক্ষতিকর সংক্রমণকে প্রতিরোধ করা যায়। যে অণুর ব্যবহার করে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়া হয় তাকে বলে অ্যান্টিজেন যা সব ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসে থাকে। এই রাসায়নিক অণু শরীরে ইনজেকশন করে অল্পমাত্রায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। শরীরে রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা এই অ্যান্টিজেনকে চিনে রাখে। পরবর্তীতে ওই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা তাকে দ্রুত চিনে নিয়ে আক্রমণ করে। এর ফলে ওই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে শরীর অসুস্থ হওয়াকে প্রতিরোধ করা যায়।

আজ অবধি আবিষ্কৃত সকল ভাইরাসের (ব্যাকটেরিয়াও) প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করেন। সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত নভেল করোনা ভাইরাস ২০১৯ এরও টীকা আবিস্কার হয়ে গেছে এবং দ্রুত তা বাজারে আসবে বলে সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

১৬. বিভিন্ন ভাইরাসের মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ কী ?

উত্তর ঃ জীবজগতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। এই ঘটনা জীব বিবর্তনকেই প্রমাণ করে। জীব বিবর্তন হয় জীবজগতের জিনোমের মধ্যে থাকা যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক জিনের পরিবর্তন দ্বারা। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা মিউটেশন নামে চিহ্নিত করে থাকেন। এই জিনগত পরিবর্তনের ফলে অনেক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জীবের বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়।

জড় অবস্থা থেকে যখন কোন ভাইরাস জীবিত পোষকের দেহকোষে প্রবেশ করে তখন তার জড় অবস্থা আর থাকে না। তখন সে সজীব। এই সজীব ভাইরাসগুলি বিবর্তনের নিয়মেই জিনের গঠনসজ্জা ও গুণের পরিবর্তনের ফলে নতুন ভাইরাস

সৃষ্টি করে। এটি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এক একটা ভাইরাসের জিনসজ্জা দেখেই ভাইরাসটিকে সনাক্ত করা হয়। নতুন 'নভেল করোনা ভাইরাস ২০১৯' (বা 2019-nCov) এর জিনোম সিকোয়েন্স বা জিনগত সজ্জাকে গবেষণা করে জানা গেছে যে এই ভাইরাসের আরএনএ এর সাথে সার্স (SARS) ভাইরাসের আরএনএ-র ৮০% সাদৃশ্য আছে এবং ব্যাটভাইরাস এর সাথে ৯৬% সাদৃশ্য আছে। যদিও এই নভেল করোনা ভাইরাস সার্স ভাইরাসের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি প্রাণঘাতী এবং তার বিস্তার ক্ষমতা ৮৩ শতাংশ বেশি।

১৭. কোন উপায়ে একই ধরনের ভাইরাসের নানা প্রকারভেদ সৃষ্টি হয় ?

উত্তর ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতিতে অন্যান্য জীবের ন্যায় ভাইরাসের বিবর্তনও সম্ভব। তবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। প্রাকৃতিক নিয়মে ভাইরাসের মিউটেশন হতে হলে তা পোষকের দেহে থাকাকালীন সময়ই হওয়া সম্ভব। কেননা পোষকের দেহের বাইরে ভাইরাস বংশবিস্তার করতে পারে না। কিন্তু সিন্থেটিক ভাইরোলজি নামক বিজ্ঞানের নতুন শাখায় জিন কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের সজ্জার পরিবর্তন ঘটিয়ে, একাধিক ভাইরাসের জিনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পরীক্ষাগারে নতুন ভাইরাস তৈরি সম্ভব।

১৮. সব ভাইরাস সমস্ত জীবদেহে ছড়াতে পারে কী ?

উত্তর ঃ এক কথায় এর উত্তর হল – না। কিন্তু ভাইরাস লাফ দিয়ে এক পোষক থেকে অন্য পোষকের দেহে ছড়াতে পারে। বলা হয়েছে যে নভেল করোনা ভাইরাস চীনের উহান শহরের হুয়ানান সি ফুড মার্কেট (সামুদ্রিক খাদ্যের বাজার) থেকে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়েছে। তবে নিশ্চই এই ভাইরাস এক পোষকের দেহ থেকে অন্য পোষকের (মানুষ) স্থানান্তরিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম পোষক এখনও নির্দিষ্ট নয়। তাছাড়া এক পোষক থেকে অন্য পোষকে ভাইরাসের স্থানান্তরণ কিন্তু অনির্দিষ্ট নয়।

বিবর্তনের নিয়মে জীব জগৎ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে গঠিত। পোষকের বৈসাদৃশ্যের জন্য বেশির ভাগ ভাইরাস পোষক নির্দিষ্ট। আবার সাদৃশ্যের জন্য একাধিক জীবে একই ভাইরাস আশ্রয় নিতে পারে।

১৯. প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তন ছাড়াও কি গবেষণাগারে ভাইরাসের মিউটেশন ঘটানোর উদাহরণ আছে কী ?

উত্তর ঃ বর্তমানে বিশ্বে এমন অসংখ্য গবেষণাগার আছে যেখানে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াসহ নানা জীবাণু নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। আধুনিক বায়োটেকনিক্যাল প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন ভাইরাসের জিনগত সজ্জার পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃত্রিমভাবে মিউটেশন বা রিকম্বিনেশন করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এনআইএইচ এবং এনসিআই সেলুলার কন্ট্রোল মেকানিজম এর বিভাগীয় প্রধান ডঃ রবার্ট গেলো, যিনি লিউকোসিয়া'র জন্য দায়ি আরএনএ – রেট্রোভাইরাস এর আবিস্কারক দেখান যে কিভাবে এক স্ট্রেইন ভাইরাসের আরএনএ অন্য স্ট্রেইন এর ভাইরাসের মধ্যে প্রবেশ করালে যে মিউট্যান্ট সৃষ্টি হয় তা এইডস্ ভাইরাসের অনুরূপ কাজ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জৈব অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ডঃ ফ্রান্সিস বয়েল ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২০, 'গ্রেট গেইম ইন্ডিয়া' নামক ওয়েবসাইটে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন "বিএসএল ফোর ল্যাব অত্যন্ত গুরুতর ধরনের। এই ধরনের বেশ কয়েকটা ল্যাব যুক্তরাষ্ট্রেও আছে, এগুলো আসলে ডিএনএ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণাত্মক জীবাণু অস্ত্র বিকশিত করতে ব্যবহৃত হয়।

এই কারণেই আমার মনে হয়েছে উহান বিএসএল-ফোর ল্যাবই হল নভেল করোনা ভাইরাসের উৎস। আমার ধারণা ওরা সার্স নিয়ে গবেষণা করছিল এবং আরও কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে এটাকে আরও মারাত্মক প্রাণঘাতী অস্ত্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল"।■

করোনা

– সুরজিৎ সী

বিশ্বজোড়া বির্বণতা ফুরিয়ে গেছে হাসি
মক্কা খালি মদিনা খালি খালি গয়া কাশি।
মুখ থুবড়ে ধর্মধ্বজা এই পৃথিবীর বুকে।
আতঙ্কিত দেবতাও মাস্ক লাগায় মুখে।
মাস্ক খুলে ভারতবাসী বলতো একটু কেশে,
রাম মন্দির বাবরি মসজিদ নাকি হাসপাতাল চাই দেশে ...?
মন্দির আর মসজিদ যদি এরপরেও চাই,
সন্দেহ নেই তোরাই আসল করোনার সৎভাই।

(*সোসাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত*)

বিশেষ রচনা

নতুন করোনা ভাইরাস কি জীবাণু অস্ত্র ?

চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে এই সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর গত ১লা ডিসেম্বর ২০১৯ থেকেই উহানের হাসপাতালে এই ভাইরাস সামুদ্রিক খাদ্যের পাইকারি বাজারটিকে সংক্রমণের উৎস হিসাবে চিহ্নিত করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই পাইকারি বাজারে সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রাণী এবং মুরগী, শুকর, গন্ধগোকুল, কুকুর ইত্যাদির মাংস বিক্রি হত। ৯ই জানুয়ারি ২০২০, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) একটি বিবৃতিতে জানায় যে একটি নতুন করোনা ভাইরাস এই সংক্রমণের জন্য দায়ি যা সার্স ভাইরাস নয়। হু এই ভাইরাসের নামকরণ করে ২০১৯-নভেল করোনা ভাইরাস (2019-nCoV)। ১০ই জানুয়ারি চীনা বিজ্ঞানীরা হু-র নেতৃত্বে এই নতুন ভাইরাসটির জিনোম সিকোয়েন্স (জিনের বিন্যাসক্রম) আবিষ্কার করে তা বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য পেশ করে। ৬ই ফেব্রুয়ারি হু এই নতুন করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন (টীকা) প্রস্তুতি, ডায়াগনোসিস (রোগ নির্ণয়) এবং থেরাপিউটিস (চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় এবং কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ) এর জন্য বিশ্বের গবেষক, গবেষণায় অর্থ লগ্নীকারী সংস্থা এবং বিশ্বের সকল সরকারি সংস্থাগুলির কাছে আহ্বান রেখেছে। হু জানিয়েছে যে এই কাজে অন্তত ৬৭৫ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) ডলার (১ ডলার = ৭২.১৮ ভারতীয় টাকা) অর্থের প্রয়োজন। এই সংক্রমণের মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ভারতসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্র চীন সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

নতুন করোনা ভাইরাসের সৃষ্টি রহস্য ঃ এই নতুন করোনা ভাইরাস, যাকে হু নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে জীববিজ্ঞানীরা ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস নাম দিয়েছেন তা হল একটি বিটা করোনা ভাইরাসের বৈচিত্র্য। প্রাথমিকভাবে উহান শহরের হুয়ানান অঞ্চলের প্রাণী খাদ্যের পাইকারি বাজারে বিক্রিত বাদুর, গন্ধাগোকুল, প্যাঙ্গোলিন, সাপ প্রভৃতিকে এই ভাইরাসের প্রাথমিক পোষক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এইসব প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে বিস্তারিত গবেষণায় কিন্তু এখনও অবধি এই ভাইরাসের কোন হদিশ মেলেনি।

উহানের যে ডাক্তাররা রোগীদের হাসপাতালে চিকিৎসা করেন তাঁরাই প্রথম সার্স ভাইরাস আক্রান্তদের মত রোগীদের নজর করে সতর্ক বার্তা দেন এই অসুখ সম্পর্কে। এমনই একজন চীনা ডাক্তার হলেন লি ওয়েনলিয়ার। তিনি একজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি তাঁর হাসাপাতালে ৭ জন এমন ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের নজর করেন যারা এই ভাইরাস আক্রমণের শিকার বলে তিনি মনে করেন। প্রসঙ্গত ২০০৩ সালে চীনসহ বিশ্বের নানা দেশে সার্স ভাইরাস আক্রমণজনিত মহামারি হয়েছিল। ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৯ ডঃ লি তাঁর পরিচিত ডাক্তারদের সোস্যাল মিডিয়াতে এই খবর করেন এবং সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সকলকে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দেন। উহান শহরের মেয়র এই নেতিবাচক খবর প্রচার না করার নির্দেশ দেন এবং বলেন এই ডাক্তারদের বলতে হবে তারা মিথ্যা খবর প্রচার করে ভুল করেছেন। ডঃ লি-র কাছে ৩রা জানুয়ারি ২০২০ পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো'র কর্তারা গিয়ে 'মিথ্যা প্রচার' বন্ধ করার জন্য ভুল স্বীকার করতে একটি কাগজে সাক্ষর করায়। ৯ই জানুয়ারি নতুন করোনা ভাইরাসের কথা স্বীকৃত হওয়ায় সারা বিশ্বে আলোড়ণ ওঠে। পরদিনই ডঃ লি'র কাশি শুরু হয়। তার পরদিন থেকে প্রবল জ্বর। আরও ২দিন পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৩০শে জানুয়ারি ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায় ডঃ লি নভেল করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০, মানবসেবায় আত্মনিয়োগকারি এই ডাক্তারের মৃত্যু হয়।

গত ১০ই জানুয়ারি ২০২০, নভেল করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স প্রকাশ হওয়ার পর পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন। গবেষণার পর স্ক্রিপস্ রিসার্চ সংস্থার বিজ্ঞানী মাইকেল ফরজন মন্তব্য করেছেন "The genome of the novel corona virus consists of a single strand of RNA. Microbes with that kind of genome mutate notoriously quickly." অর্থাৎ এই নতুন করোনা ভাইরাসে একটি আরএনএ সজ্জা আছে এবং এই ধরনের জিনোম-এর ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে মিউটেশন হয়।

ইভল্যুশনারি বায়োলজিস্ট অ্যানড্রিউ রামবাট হিসাব করে বলেছেন যে এই ভাইরাস সার্স ভাইরাসের সাথে ৮৯ শতাংশ সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩১শে জানুয়ারি ২০২০, বিজ্ঞানী জন কোহেক দ্বারা প্রকাশিত গবেষণাপত্র (Mining Corona Virus genomes for clues to the outbreaks origins)-এ বলা হয়েছে যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পিছনে চীনের উহান শহরের সামুদ্রিক খাদ্যের পাইকারি বাজারের ভূমিকা অত্যন্ত ধোঁয়াশাপূর্ণ রয়ে

গেছে। বাজারের পরিবেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং ঐ ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স এর সাথে কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আত্মীয়দের নিয়ে (যেমন বাদুরের শরীরে প্রাপ্ত) ভাইরাসের ফ্যামিলি ট্রি বা বংশতালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তুত এই তালিকা থেকে বিজ্ঞানীদের সন্দেহ, বাদুরের শরীরে প্রাপ্ত ভাইরাস এবং **২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস এর মধ্যবর্তীতে সম্ভবত এক বা একাধিক পোষক ছিল।**

উক্ত গবেষণাপত্রে লেখা হয়েছে যে বিজ্ঞানী বেডফোর্ড এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাদুরের শরীরে প্রাপ্ত Ra TG13 এবং 2019-nCoV র মধ্যে ১১০০ টি নিউক্লিওটাইডের পার্থক্য আছে। বিজ্ঞানী বেডফোর্ড দ্বারা প্রস্তুত ফ্যামিলি ট্রি অনুসারে এই দুটি ভাইরাসের পূর্বসূরীরা রয়েছে ২৫-৬৫ বছর আগেকার। বিজ্ঞানী বেডফোর্ডের মতে **RaTG13 থেকে 2019-n CoV হতে প্রাকৃতিকভাবে কয়েক দশক সময় লাগার কথা।**

কিন্তু সাম্প্রতিক প্রকাশিত জিনোম সিকোয়েন্স থেকে জানা গেছে যে এই **নভেল করোনা ভাইরাস মানুষের শরীরে এসেছে অতি সম্প্রতি, যা হু নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে। যদিও কোন্ প্রাণীর শরীর (প্রাথমিক পোষক) থেকে তা এসেছে এখনও জানা যায়নি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এটা অস্বাভাবিক।**

এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিস এর ভাইরোলজিস্ট মন্তব্য করেছেন **"বাদুরের শরীরে পাওয়া ভাইরাস এবং বর্তমানে মানুষের শরীরে পাওয়া নভেল করোনা ভাইরাসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘোলাটে।"**

অতি সম্প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একটি দল, কুসুমা স্কুল অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, ইন্ডিয়ান স্কুল অফ টেকনোলজি, নিউ দিল্লী এবং আচার্য নরেন্দ্র দেব কলেজ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে **"নভেল করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের সাথে HIV-IgP 120 এবং Gag এর ভুতুরে সম্পর্ক পাওয়া গেছে"** শীর্ষক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। এই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে এই নতুন করোনা ভাইরাসের বিবর্তনের ইতিহাস ধোঁয়াশায় পরিপূর্ণ। এই করোনা ভাইরাসের গঠন অন্যান্য করোনা ভাইরাসের থেকে একেবারে আলাদা। এর স্পাইক গ্লাইকোপ্রোটিন (S) এর মধ্যে চারটি এমন অ্যামাইনো অ্যাসিডের অবশেষ পাওয়া গেছে যা এইচআইভি ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অর্থাৎ এই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দল সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে অন্য করোনা ভাইরাসের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাসের চারটি অণু সংযুক্ত করে গবেষণাগারে এই নভেল করোনা ভাইরাস কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণাপত্র দ্রুত চাপের কাছে নতি স্বীকার করে রাতারাতি প্রত্যাহার করা হয়। প্রত্যাহারের কোনো কারণ জানা যায়নি।

কিন্তু গবেষণাপত্রটি প্রত্যাহৃত হলেও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্য থেকেই গেল, কারণ চীনে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার লোপিনাভির (Lopinavir) এবং রিটোনাভির (ritonavir) নামক দুটি ওষুধের সংযুক্ত ড্রাগ ব্যবহার করা হচ্ছে Abb Vie কোম্পানির Kaletra নামক ব্র্যান্ড নামে। এই ওষুধটি এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের ইনকিউবেশন পিরিয়ড বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। সমালোচকরা বলেছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কুৎসা রটাচ্ছেন এবং মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের বাঁচানোর শেষ চেষ্টায় এইচআইভি-তে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ ব্যবহারকে ভিত্তি করে মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছেন। যদিও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে যারা খারিজ করেছেন তারা কিন্তু স্পাইক গ্লাইকোপ্রোটিনে অন্য অণু-র উপস্থিতি অস্বীকার করতে পারেননি এবং এত অল্পদিনে এই ভাইরাসের প্রাকৃতিক পোষক কোথায় তার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব ২০১৯ নভেল করোনা ভাইরাস, যা বিশ্ব জুড়ে মহামারি সৃষ্টি করেছে তার জন্ম নিয়ে রহস্যের অবসান হয়নি।

তবে কি নভেল করোনা ভাইরাস জীবাণু অস্ত্র?

ওয়াকিবহাল মহলের অজানা নয় যে যুদ্ধের মারণাস্ত্র হিসাবে বোমা, গুলি, রকেট, কামান এর পাশাপাশি A B C বা Atomic Weapon (পারমাণবিক অস্ত্র), Biological Weapon (জীবাণু অস্ত্র) এবং Chemical Weapon (রাসায়নিক অস্ত্র) বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়কাল থেকে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা জীবাণু অস্ত্রের ব্যবহার আরও সুসংঘটিতভাবে, করেছে মানুষ মারার পাশাপাশি ওষুধ এবং চিকিৎসার বাজার সম্প্রসারণের জন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি রাশিয়ায় অ্যানথ্রাক্স ছড়িয়েছিল। দুটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদীরা প্লেগ, স্মলপক্স, অ্যানথ্রাক্স, করোনা, এনসেফালাইটিস, টাইফাসের মত জীবাণুকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। নাৎসি জার্মানি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে, জাপশক্তির থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া চীনে যেমন এর ব্যবহার করেছে তেমনি লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধকে কাবু করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা রাসায়নিক এবং জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করেছে। এছাড়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার সর্বত্র এর ব্যবহার নিরন্তর চালিয়ে আসছে।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব জুড়ে জীবাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের দাবি উঠে আসে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জীবাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়ে ১৭৮টি দেশকে নিয়ে বায়োলজিক্যাল ওয়েপন কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে জীবাণু অস্ত্র তৈরি এবং তার প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত **সুকৌশলে ঐ আন্তর্জাতিক চুক্তিতে একটা বিরাট ফাঁক রেখে দেওয়া হয়। কনভেনশনের ঘোষণায় বলা হয় আত্মরক্ষার্থে এ বিষয়ে গবেষণায় কোন বাধা নেই। তবে গবেষণা চলতে পারে একমাত্র বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু)র অনুমতি ও নজরদারিতে।** অর্থাৎ ১৯৭৫ এর কনভেনশনে রাষ্ট্রসংঘের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সর্বোচ্চ সংগঠন (হু)র দায়িত্বে বিশ্বের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির পুঁজিপতিশ্রেণী তথা এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ইচ্ছানুসারে এই গবেষণা নিরাপদে চলার পাকা ব্যবস্থা হল। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে এর ব্যবহারের পাশাপাশি তার প্রতিষেধক এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিরাট বাজার তাই হু-র পরিচালনায় চলছে।

এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বায়ো সেফটি লেভেল ফোর (সংক্ষেপে বিএসএল৪) পরীক্ষাগার তৈরি হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমতি ও নজরদারিতে। এমন পরীক্ষাগার আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮টি, সমগ্র ইউরোপে ১১টি, কানাডায় ইউনিপেগে, ইসরায়েলে, ভারতের পুণায় এবং চীনের উহান শহরে। যে সামুদ্রিক পাইকারি বাজারটিকে এবার সংক্রমণের উৎসস্থল বলা হয়েছিল তার থেকে এই পরীক্ষাগারটি মাত্র ২০ মাইল দূরে অবস্থিত।

এখন মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। নতুন করোনা ভাইরাস যদি প্রাকৃতিক নিয়মে নির্দিষ্ট পোষকের দেহে বিবর্তিত হয় তবে এই অভিযোগ ভ্রান্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু যদি দেখা যায় প্রাকৃতিক নিয়মে বিবর্তিত হওয়ার প্রমাণ নাই বরং কৃত্রিম পদ্ধতিতে তার উদ্ভাবন হয়েছে তবে তা ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী হওয়ায় একে সম্ভাব্য জীবাণু অস্ত্রই বলতে হয়। আসুন বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করি –

(১) **সংক্রমণের কেন্দ্রস্থল চীনের উহান শহর** – যার একদিকে বিএসএল-৪ পরীক্ষাগার আর অন্যদিকে সামুদ্রিক খাদ্যের পাইকারি বাজার। এদের মাঝে দূরত্ব মাত্র ২০ মাইল। ভাইরাসটির জিনোম সিকোয়েন্স থেকে ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাণীগুলির মধ্যে যে প্রাণী থেকে তা মানুষের শরীরে সংক্রামিত হয়েছে তা বার করা আজকের দিনে কোন দূরূহ কাজ নয়। ঐ অঞ্চলের জিন বৈচিত্র্য কী বা ঐ সামুদ্রিক খাদ্যের বাজারে আসা প্রাণীগুলিও অজানা নয়। ১লা ডিসেম্বর থেকে নতুন ভাইরাসে সংক্রামিত রোগী ভর্তি হচ্ছে। অর্থাৎ এই তিন মাসাধিককাল সময় অতিবাহিত হলেও সেই প্রাণীটি খুঁজে পাওয়া গেল না যা নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাথমিক পোষক, যার মধ্যে ভাইরাসটির বিবর্তন হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে।

(২) কানাডার বিএসএল-৪ গবেষণাগার ইউনিপেগের পরীক্ষাগারে নতুন করোনা ভাইরাসের আগমণের খবর, এত হইচই ফেললেও প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত এই খবর সম্পর্কে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নিশ্চুপ কেন? গ্রেট গেইম ইন্ডিয়া নামক ওয়েব সাইটে বলা হয়েছে যে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের ১৩ তারিখ সৌদি আরবের এক ব্যক্তি জেড্ডা শহরের এক হাসপাতালে এক অজানা সংক্রমণে আক্রান্ত হন। মিশরের বিখ্যাত ভাইরোলজিস্ট ডঃ আলি মহম্মদ জাকি তার দেহ থেকে এই ভাইরাসের স্যাম্পেল সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে তাঁর ওই অজানা সংক্রমণে মৃত্যু হয়। এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। এরপর নাকি ডঃ জাকি এই ভাইরাস নেদারল্যান্ডের ভাইরোলজিস্ট রন ফয়চিয়ার-কে গবেষণার জন্য দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ফয়চিয়ার এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স করেছিলেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে এই ভাইরাসের নমুনা পান ডঃ ফ্রাঙ্ক প্লাম্মার। ডঃ ফ্রাঙ্ক প্লাম্মার হলেন কানাডার ন্যাশনাল মাইক্রোবাওলজি ল্যাব এর সায়েন্টিফিক ডিরেক্টর। কানাডার এই পরীক্ষাগারে কাজ করতেন দুইজন চীনা বিজ্ঞানী এবং তাদের অধীনে থাকা গবেষকরা। এঁদের নাম হল শ্রীমতী জিয়ান গুও কুই এবং তাঁর স্বামী শ্রী কেডিং ছেঙ্গ। শ্রীমতী কুইকে কানাডা সরকার পুরস্কারও দিয়েছিল। সংবাদ মাধ্যম গ্রেট গেইম ইন্ডিয়ার দাবি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কানাডা থেকে জাহাজে এই বৈজ্ঞানিকরা চীনে এসেছিল। এদের সঙ্গেই কিছুদিন আগে চীনে এসেছিল ওই ভাইরাস। চীনের অন্যতম বৃহৎ নিউজ নেটওয়ার্ক এনটিডি টেলিভিশনে এই ঘটনার রিপোর্ট হয়েছিল।

(৩) পূর্বে উল্লিখিত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণাপত্রে কৃত্রিম উপায়ে এইডস এর অণুর সংমিশ্রণে করোনা ভাইরাস সৃষ্টির গবেষণাপত্র ২ দিনের মধ্যে আর্কাইভ থেকে প্রবল চাপে প্রত্যাহার করা হলেও করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনে ইনসারশান কিভাবে হল তার উত্তর আজও প্রাকৃতিক উপায়ে নভেল করোনা ভাইরাসের জন্ম হয়েছে এমন দাবিদাররা দিতে পারেননি। কোন্ পোষকে প্রাকৃতিক উপায়ে এর বিবর্তন হল তাও নয়।

সুতরাং সমস্ত তথ্য ইবোলা, জিকা, সার্স, এইচআইভি ভাইরাসগুলির মতই কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে মিউটেশনের

ফল – এই মতামতকে জোরদার করছে।

এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জৈব অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফ্রান্সিস বয়েল গত ৩রা ফেব্রুয়ারি 'গ্রেট গেইম ইন্ডিয়া' নামক একটি ওয়েব সাইটে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তার অংশ বিশেষ সংক্ষিপ্ত রূপে তুলে ধরা হল। এই সাক্ষাৎকারটি পরিচালনা করেছে জিওপলিটিক্স অ্যান্ড এম্পায়ার নামক সংস্থা।

জিওপলিটিক্স অ্যান্ড এম্পায়ার ঃ উহানে সাম্প্রতিক সংক্রমণ প্রশ্নে আপনি কি বলবেন?

ডঃ ফ্রান্সিস বয়েল ঃ হ্যাঁ অনেক প্রশ্ন। আমার মনে হয় আমরা একটা একটা করে ধরতে পারি। আপনি যদি গুগল সার্চ এ লেখেন "ডাজ চায়না হ্যাভ এ বিএসএল ফোর ল্যাবরেটরি"? তালিকায় শীর্ষে উঠে আসবে উহান। ... বিএসএল ফোর ল্যাব অত্যন্ত গুরুতর ধরনের। এই ধরনের বেশ কয়েকটা ল্যাব যুক্তরাষ্ট্রেও আছে, এগুলি আসলে ডিএনএ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণাত্মক জীবাণু অস্ত্র বিকশিত করতে ব্যবহৃত হয়।

এই কারণেই আমার মনে হয়েছে উহান বিএসএল ফোর ল্যাবই হল করোনা ভাইরাসের উৎস। আমার ধারণা ওরা সার্স নিয়ে গবেষণা করছিল এবং আরও কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে এটাকে আরও মারাত্মক প্রাণঘাতী অস্ত্রে পরিণত করার চেষ্টা করছিল।

বাস্তবিকই, সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে এর প্রাণঘাতী ক্ষমতা সার্সের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি এবং সংক্রমণ বিস্তারের ক্ষমতা ৮৩ শতাংশ বেশি। এর কার্য ক্ষমতার বৃদ্ধির ফলে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ৬ ফুট বা তারও বেশি দূরত্বে এটি বাতাসে ভেসে অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারছে। অধিকন্তু এটি হু-র দ্বারা বিশেষভাবে স্বীকৃত একটি গবেষণা ল্যাব। হু এর মধ্যে ছিল এবং ওরা খুব ভালভাবেই জানে এই ল্যাবে কী চলছে। ...

... আমি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কার্যকরী, জৈব অস্ত্র কনভেনশন সংক্রান্ত আইনের খসড়া রচনা করেছিলাম। এটি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ এটিকে সাক্ষর করেছিলেন। ... আমরা এখন যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সম্মুখীন হয়েছি সেটি একটি আক্রমণাত্মক জীবাণু অস্ত্র যা উহান বিএসএল ফোর ল্যাব থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আমি একথা বলছি না যে এটা সচেতনভাবে করা হয়েছে। কিন্তু ঐ ল্যাবটির ব্যাপারে আগেই কিছু সমস্যা এবং বিভিন্ন জিনিস লিক হওয়ার রিপোর্ট ছিল। আমার আশঙ্কা, হয়ত সেই কারণেই আমরা বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি।

জিওপলিটিক্স অ্যান্ড এম্পায়ার ঃ আপনি হু-র কথা উল্লেখ করেছেন। আমি হু এবং বড় ফার্মাগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ...

ডঃ ফ্রান্সিস বয়েল ঃ হু যা বলে তা আমি বিশ্বাস করি না কারণ ওদের সবই হল বড় ফার্মার জন্য কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে, আর সিডিসি (সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন - যুক্তরাষ্ট্র) যা আসলে বকলমে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অংশীদারিত্বেই তো কাজ করে। ... বড় ফার্মা প্রসঙ্গে এটা নিশ্চিত যে ওরা আজকের অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুনাফা কামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। গতকাল ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে একটা বড় আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে সব বড় ফার্মা কোম্পানি চীনের ঘটনাকে সামনে রেখে ওদের পক্ষে যা যা ফেরি করা সম্ভব তার সবই করে চলেছে, যদিও সেগুলো মূল্যহীন এবং কোন সাহায্য করবে না। ...

... বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেটস্ জৈব অস্ত্র গবেষণার অর্থ সরবরাহ করে। এটা ঠিক। তাই আপনি ওদের এই কথায় বিশ্বাস করতে পারেন না যে ওরা বিশ্বকে আরও বেশি করে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছে। আমি বলতে চাইছি, বিল গেটস্ জনসমক্ষে স্বীকার করেছেন যে বিশ্ব আরও বসবাসের উপযোগী হবে যদি সেখানে অনেক কম মানুষ থাকে। তাই বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেট্স ফাউন্ডেশন হল ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে এবং ওরা এই ধরনের গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জিওপলিটিক্স অ্যান্ড এম্পায়ার ঃ ... আপনি কি মনে করেন ভবিষ্যতে এই দেশগুলি যেমন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইজরায়েল, সৌদি আরব, ইরান, চীন, রাশিয়া .. এদের মধ্যে যদি সংঘর্ষ হয় তবে কি তারা জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে?

ডঃ ফ্রান্সিস বয়েল ঃ নিশ্চিতভাবেই, একমাত্র এই কারণেই তো ওরা জীবাণু অস্ত্র বানাচ্ছে যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। এটা ম্যানহাটন প্রকল্পের মত। আমরা অ্যাটম বোম তৈরির জন্য টাকা ঢাললাম, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত করার জন্য এর কোন প্রয়োজন ছিল না, হিরোসিমা-নাগাসাকির (জাপানের আত্মসমর্পণের) কথা তো ওরা জানতই। হ্যাঁ এটা ঠিক, ওগুলি (জীবাণু অস্ত্র) গোপনে ব্যবহার হতে পারে। যখনই আপনি আজকের মত বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে, মানুষ এবং জন্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই হঠাৎ কোন অজানা রোগের প্রার্দুভাব দেখবেন, তখন আমি তো সন্দেহ করবই যে নিশ্চই কোন জীবাণু অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। ... আজ ওরা অ্যানথ্রাক্স সহ বিভিন্ন জীবাণু অস্ত্রের

যথেষ্ট পরিমাণ মজুত নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, সশস্ত্র এবং সজ্জিত।

...

উপরে আলোচিত সমস্ত তথ্য প্রাকৃতিক কারণে নভেল করোনা ভাইরাসের উৎপত্তিকে প্রমাণ করতে পারে নি বরং কৃত্রিমভাবে এই ভাইরাস সৃষ্টির সম্ভাবনাকেই জোরদার করছে।

মুনাফাখোরী পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ একটা নিয়ম। অস্ত্রের মারণক্ষমতা তার প্রয়োগ ছাড়া বোঝা যায় না। তাই পরীক্ষা প্রয়োজনীয়। যেমন পরীক্ষা হয়েছিল হিরোসিমা-নাগাসাকিতে। তাই জীবাণু অস্ত্রসহ বিভিন্ন ভয়ানক মারণাস্ত্রের হাত থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করতে, বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে মানব সমাজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পুঁজিবাদী সমাজের অবসান জরুরি হয়ে পড়েছে। এই সামাজিক কর্তব্য পালন করাই বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য।■

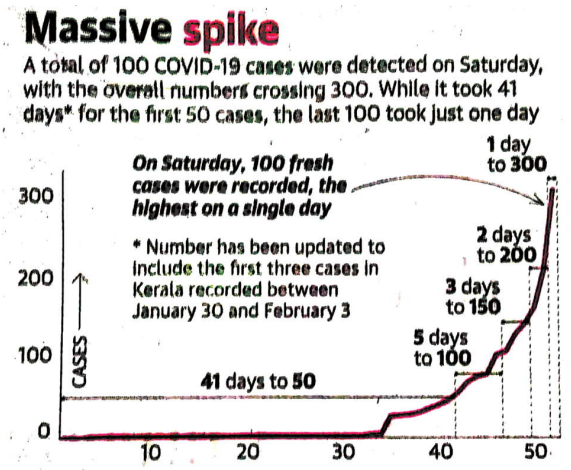

সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ২২.৩.২০২০

বিজ্ঞানের বিশেষ খরব ঃ

১০৭তম বিজ্ঞান কংগ্রেস

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণার বিকাশ নয়

গ্রামাঞ্চলে পুঁজির বাজার সম্প্রসারণকেই লক্ষ্য ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি থেকে ৭ই জানুয়ারি বেঙ্গালুরুর কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০৭তম বার্ষিকী। সম্মেলনের স্থান নির্বাচন এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকেই স্পষ্ট হয়েছে এই কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন – কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হল কৃষক ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নতি একদিকে যেমন শস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, তেমনি কৃষিপণ্যের বাজারীকরণ বেড়েছে। অন্যদিকে তা গ্রাম্য জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য এনেছে। এতদ্ সত্ত্বেও, কৃষক ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। সেই যোগাযোগ গড়ে তোলাই বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য।

দেশের প্রযুক্তি কিভাবে গ্রামগুলির বিকাশ সাধন করবে সে প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন – গ্রামের অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে স্মার্টফোন অনেক সস্তা হয়েছে, ইন্টারনেট ডেটা সস্তা হয়েছে। ফলে সকল মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সুদূর বিস্তৃত ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব হ্রাস করেছে। এর ফলে তারা তাদের কথা জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন। গ্রামে উপযোগী ও সস্তা উদ্ভাবনের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। তাই তরুণ বিজ্ঞানীদের আরও বেশি বেশি করে গ্রামোন্নয়নের কাজে যুক্ত হওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের সমস্যা এবং তার সমাধানের কথা উঠে আসেনি। লাভজনক মূল্যে ফসল বিক্রি করতে না পারার সমস্যা, ফসল উৎপাদনের খরচ অত্যাধিক বৃদ্ধির সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হওয়ার সমস্যা, সেচ ব্যবস্থার সমস্যা, ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা, কৃষি মজুরদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের বাস্তব, বৈজ্ঞানিক সমাধানের কোন কথা উঠে আসেনি। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বিকাশের উদাহরণ যা কংগ্রেসে এসেছে তাতে বড় বড় পুঁজির মালিকদের আপাতভাবে বাজার সম্প্রসারিত হতে পারে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান হবে না। দ্বিতীয়তঃ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটা প্রায়োগিক দিকমাত্র। এই কংগ্রেসে কৃষিসহ সকল মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের উপর কোন আলোকপাত করা হয় নি যা বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত ছিল।■

জলসংকট বিষয়ে সমীক্ষণ সম্পাদকমন্ডলীর রচনা বিজ্ঞানভিত্তিক নাকি অন্ধবিশ্বাস প্রসূত?

– সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ

[*বিগত নবম বর্ষ সংখ্যা-৪-এ চিঠিপত্র বিভাগে তিনটি চিঠি এসেছিল স্থানাভাবের জন্য শুধু প্রথম পত্রলেখক শ্রী সুরজিৎ সুলেখাপুত্রের দীর্ঘ চিঠির উত্তর প্রকাশ করা হল।* **– সম্পাদক, সমীক্ষণ**]

সমীক্ষণ (আগস্ট ২০১৯) এর প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'ভারত কী তীব্র জলসংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে?' সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয় (যেমন গ্লোবাল ওয়ামিং) তথা সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান মনস্কর দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা এসেছে। আমরা সবিনয়ে তা গ্রহণ করে বিচার বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করেছি। পত্রলেখক শ্রী সুরিজৎ সুলেখাপুত্র প্রচ্ছদ ও নিবন্ধের শিরোনামে অনবধানবশত বানানের গুরতর ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সমীক্ষণ পাঠ করে পাঠকরা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আশা রাখবো ভবিষ্যতেও আমরা তাঁদের ও অন্য পাঠকদের সহযোগিতা ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হব না।

আলোচনার শুরুতে এটা জানানো প্রয়োজন যে সমীক্ষণে প্রকাশিত বেশ কিছু নিবন্ধ সম্পাদকমন্ডলীর একাধিক সদস্য এমনকি তার বাইরেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন রয়েছে এমন সদস্য-সমর্থক-বন্ধুদের যৌথ প্রচেষ্টায় লিখিত হয়। সেই নিবন্ধগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রকাশিত হয় না। এই রীতি পত্রিকার প্রারম্ভিক সময় থেকেই চালু আছে।

সুরজিৎবাবু শুরুতেই লিখেছেন **"কৃষি একটি আর্থসামাজিক ও বর্তমানে যথেষ্টভাবেই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া।"** একথা একশো শতাংশ সত্য। শুধু কৃষি নয় শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিগুলি এবং তার কার্যকারণ নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। কোন নীতি বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে মৌলিক বিরোধিতা বা দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যও মূলগতভাবে রাজনৈতিক পার্থক্যকেই চিহ্নিত করে। সমাজে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তাদের স্বার্থবাহী পরস্পরবিরোধী গতিবিধির কারণেই এই পার্থক্য চিন্তাজগতে প্রতিফলিত হয়। তাই কেবল 'জলসংকট' নয় সমীক্ষণের সম্পাদকমন্ডলী দ্বারা প্রস্তুত রচনাগুলি এই পরস্পরবিরোধী মতামতের একটা নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করে – যেটাকে সে বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ মানব প্রগতির সহায়ক বলে মনে করে। বিজ্ঞান সতত প্রগতিশীল – যা বিজ্ঞানসম্মত নয় তা পশ্চাদমুখীন। কিন্তু বিজ্ঞান নির্দিষ্ট এক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রযুক্ত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই ব্যবস্থা যদি মানব প্রগতির পক্ষে বাধা হয় তবে বিজ্ঞানের প্রয়োগে তাও প্রতিফলিত হয়। অনেকের কাছে তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির 'পশ্চাদ্‌পদতা' 'সীমাবদ্ধতা' বলে প্রতিভাত হয়।

সমীক্ষণের নিবন্ধের বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় **সরকারের নবগঠিত 'জলশক্তিমন্ত্রক' দ্বারা 'জলশক্তি অভিযান' এ অবতরণ**। এই অভিযানের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল **'নীতি আয়োগের' ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের এক রিপোর্ট যা বলছে এই ২০২০ তেই দিল্লী-চেন্নাই-বেঙ্গালুরু সহ একুশটা বড় শহরে ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডার কার্যত নিঃশেষ হয়ে যাবে**। আর বিশেষভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল ২০১৯ এর গ্রীষ্মে চেন্নাই শহরের জলাভাব দেখে। নীতি আয়োগের রিপোর্ট-এর ভিত্তিটাই যে অসত্য, জল মেশানো তার তথ্য প্রমাণ সমীক্ষণের নিবন্ধে দেওয়া হলেও সুরজিৎবাবু তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। কেন?

'বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্ররূপে 'সমীক্ষণ' মনে করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবন (আবার তা নিয়ে বিতর্ক-আলোচনা) সাধারণের নাগালের বাইরে থাকার কারণ হল বর্তমান পণ্য অর্থনীতি। এটা জনসমক্ষে তুলে ধরা তার কর্তব্য। সেকারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলাভাব জনিত পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ ভিন্ন সমাধানের অন্য কোন পথ নেই। তার প্রয়োজনে জলবিদ্যা বা হাইড্রোলজি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। যা এই নিবন্ধের মুখ্য দিক। বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হবে না? হলে ক্রুদ্ধ হবার কী আছে? উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল পাঠক্রমের 'সহজলভ্য' বিষয় আলোচনা করা যাবে না? এই সহজলভ্য জ্ঞান সকলে অর্জন করে ফেলেছেন? তাই যদি হয় তবে সহজলভ্য আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় যখন লেখা হয় **"কোটি বছরে জমা পৃথিবীর নিজস্ব জলভান্ডার তুলে গড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল মাঠে"** – তখন এই বাংলায় 'রেসিডেন্স টাইম' সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা একজন মানুষও পাওয়া গেলনা প্রতিবাদ করার জন্য? পৃথিবীর কোন্ জলভান্ডারে কোটি

বছর জল থাকে? লক্ষ-কোটি বছর এসব কি কথার কথা? 'টাইম স্কেল' এর কি কোনও মূল্য নেই? সে সব না জানলে সত্য তো আড়ালেই থেকে যাবে? যখন বলা হয় এক কেজি হাইব্রীড চাল তৈরিতে ২০০০-৩০০০ লিটার জল লাগে (এর সাথে পড়ুন এক কেজি গম তৈরিতে ১৮০০ লিটার, মাটি ও আবহাওয়া ভেদে এক কেজি চিনির জন্য ৮০০-২২০০ লিটার, এক কেজি মাংসের জন্য ৮০০০ লিটার জল ইত্যাদি ইত্যাদি) তখন জলচক্রের সাথে সাথে মাধ্যমিক পাঠ্য রসায়ন প্রচার করতে হবে না পাল্টা প্রশ্ন করার জন্য? তাহলেই তো প্রশ্ন উঠবে ভাত খেতে পাওয়া ২০ কোটি মানুষ (ধরা যাক) গত ৫০ বছর ধরে কত লক্ষ লক্ষ কোটি লিটার ভূমিজল এদেশের ভূমিতল থেকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে? 'ধরা যাক' এটা বিজ্ঞানসম্মত(!) তাহলেও তো মানুষ প্রশ্ন করতে শিখবেন সেই পালিয়ে যাওয়া জল যদি 'রিচার্জ' না হয়ে থাকে তবে দশবছর আগেই তো সমগ্র ভারত মরুভূমি হয়ে যাবার কথা ছিল! **"যাঁরা একটু আধটুও খবর রাখেন, তাঁরা জানেন, এত রাসায়নিক সার, বিষ দেওয়ার পর আজ আমাদের হাতে আছে বালি হয়ে যাওয়া উষর মাটি, মৃত নদী, বিপুল সংখ্যায় বিনষ্ট পাখি-পতঙ্গ, আর কঠিন নিষ্ঠুর সব মারণ রোগ, খালি হতে বসা ভূমিজলের ভান্ডার ..."**[১] এই ভয়ংকর ভীতি সৃষ্টিকারী আবহাওয়ায় সহজলভ্য বিজ্ঞান থেকেই তো মানুষ প্রতি-প্রশ্ন তুলবেন এমন অবস্থায় এই ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চাল রপ্তানিকারী হয়ে উঠলো কী করে? মানুষের গড় আয়ুষ্কাল কমতে কমতে কত তে এসে দাঁড়িয়েছে? তাই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হলেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সত্যের চর্চা সমীক্ষণের পাতায় চালাতেই হবে। কেবল লেখায় নয় হাটে-মাঠে নিয়ে গিয়ে বোঝাতে হবে। এই কাজের জন্য তীব্র বিরোধিতা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ সমীক্ষণকে সহ্য করতে হবে!

কৃষি প্রসঙ্গ ঃ – সমীক্ষণের নিবন্ধে বলা হয়েছিল পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষ, কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে **ভারতের শাসকশ্রেণী সবুজ বিপ্লব আখ্যা দিয়েছে**। [অর্থাৎ আমরা সবুজ বিপ্লব (বা শ্বেত বিপ্লব ইত্যাদি বলিনি-সাধারণতঃ বলিওনা)] পরবর্তীতে সারা দেশেই এই ধরনের উৎপাদন ধীরে ধীরে চালু হয়েছে। এই কৃষিব্যবস্থা পুরনো প্রকৃতিনির্ভর ভোগের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থার বদলে বাজারমুখী কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী কৃষির প্রচলন করেছে। – এটা কি সত্য নয়? তাহলে এই সত্য উল্লেখ করলে 'সবুজ বিপ্লবের' প্রশংসক বলে দেগে দেওয়ার যুক্তিটা ঠিক বোধগম্য হয় না। এটা বোধগম্য হয় 'স্বতঃস্ফূর্ত কৃষি বিকাশ কথাটায় সুরজিৎবাবুর প্রচন্ড আপত্তি।কেন? আপনার কথামতই কৃষি নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক(-অর্থনীতির) বিষয়। তদুনসারে কৃষিতে পুঁজিবাদী রূপান্তর হয় উৎপাদনের উপায় জমি থেকে কৃষক (Peasant) দের উচ্ছেদ করে। কৃষিজমির মালিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি পুঁজির মালিক (Farmer) দের দ্বারা বৃহদ আকারের কৃষিখামার নির্মাণ দ্বারা। সার-বীজ-কীটনাশক-সেচব্যবস্থার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ মারফৎ বাজারের জন্য কৃষিপণ্য উৎপাদন দ্বারা যার একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা লাভ। এই প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র-মধ্য-ভূমিহীন কৃষক পরিণত হয় মজুরী দ্বারা নিযুক্ত কৃষি শ্রমিকে। কৃষিপণ্য নির্বাচন থেকে বাজারজাতকরণ সবই রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজিপতিদের হাতে থাকে। ভারতে সার-বীজ-কীটনাশকের বাজার সৃষ্টি করার তাগিদে বাজারমুখী পুঁজিবাদী কৃষিপদ্ধতি চালু হলেও ভূমি সংস্কার মারফৎ ক্ষুদ্র-মাঝারি চাষী (Peasant) দের হাতে জমির মালিকানা (প্রজাস্বত্ব) বজায় রেখেছে। রাষ্ট্রীয় খামার বা বৃহৎ পুঁজির ফার্ম তুলনায় নগণ্য। (কৃষি থেকে সমস্ত আয়কে আয়করমুক্ত রাখা হয়েছে) যে কারণে ভারতের কৃষিতে পুঁজিবাদী রূপান্তর অনিয়ন্ত্রিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। থমকে থমকে এগোনো। এসব সমীক্ষণের বানানো গল্প নয়। যাই হোক সুরজিৎবাবু হয়ত 'স্বতঃস্ফূর্ত' শব্দটাকে প্রশংসা ধরে নিয়ে তীব্র আপত্তি পেশ করেছেন।

একথা পরিষ্কার যে সুরজিৎবাবু বা তিনি যাঁদের চিন্তা-রচনা অবশ্যপাঠ্য জ্ঞানে সুপারিশ করেছেন তাঁদের সকলেরই মত হল কৃষিকে পুঁজিবাদের পূর্বেকার সামন্ত কৃষিব্যবস্থায় আটকে রাখতে হবে। এগুলি কোনটাই অনুন্নত-অবৈজ্ঞানিক-অপ্রতুল ছিল না বরং সেই বেদের যুগ থেকে জলসংরক্ষণ-বীজ নির্বাচন-প্রাকৃতিক সার-সেচ সমন্বিত সুসমঞ্জস ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। যদিও তাঁরা বলেন "নতুন নতুন জিনিষ শিখলে তবেই সময়ের সাথে সাথে চলে আরো ভালভাবে থাকা যায়। পুরনো জানার সাথে সাথে নতুন জানাকে মেলাতে হবে।"[২] কিন্তু তাকে সাথে সাথেই নস্যাৎ করে দেওয়া হয় যখন বলা হয় "জলও পুরনো আর মাটিও পুরনো, তা নিয়ে আগাগোড়া একেবারে নতুন কোন নিয়ম কি সত্যিই কাজের হতে পারে?"[৩] জগতে সবই তো ঐ কার্বন-হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন-অক্সিজেন ইত্যাদি দ্বারা তৈরি! (ঠিক বলা হল না – এমনকি 'কৃত্রিম' মৌলও সৃষ্টি করে ব্যবহার করছে বিজ্ঞান) তাহলে নতুন আর কী হতে পারে? এই দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক কিনা তা পাঠকরাই বিচার করবেন।

সমীক্ষণ মনে করে উন্নত-অপ্রতুল ইত্যাদি সময়ের বিচারে

ফুটনোট ঃ – ১) ভূমিজল – জয়ামিত্র পি.বি.এস পৃষ্ঠা-৮। ২) ঐ পৃষ্ঠা-৮। ৩) ঐ পৃষ্ঠা-৮।

আপেক্ষিক। কিন্তু কোন একটা উৎপাদনব্যবস্থা যখন অন্ন-বস্ত্র সহ জনগণের বৈষয়িক চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয় তখনই তার গর্ভে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির জন্ম হয়। সেভাবেই সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতির গর্ভে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল এবং বর্তমানে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির গর্ভে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। তার বিকাশের বাধা দূর করাই বিজ্ঞানী তথা বিজ্ঞানমনস্কদের কর্তব্য। তাই **আজকের দিনে** দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান মনস্ক মনে করে কৃষি সমস্যার মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত দাবি হওয়া উচিত – **কৃষিপণ্য উৎপাদন-সংরক্ষণ-বন্টন-বিক্রয় সহ সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।** 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' এর বিপরীত কিছু বলে নাকি? আমাদের জানার আগ্রহ আছে।

বিজ্ঞান মনস্ক মনে করে কেবল পুঁজিবাদী কৃষি নয়, ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফার উপর ভিত্তি করে টিঁকে থাকা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই মানবকল্যাণ তথা তার ভবিষ্যৎ এর পক্ষে অর্থাৎ বিজ্ঞানের অবাধ-সার্বিক বিকাশের বাধা। সুতরাং সার্বিকরূপে নিয়ন্ত্রিত-পরিকল্পিত-জনমুখী-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা উপযুক্ত কৃষিপদ্ধতি নির্বাচন করা পুঁজিবাদে সম্ভব নয়। সেজন্য কৃষিতে চিরাচরিত সামন্তবন্ধন ভেঙ্গে পড়ছে বলে হাহাকার না করে পুঁজিবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানোই কর্তব্য।

সুরজিৎবাবু সমাজবিজ্ঞানের এই মৌলিক নীতিকেই তীব্র বিরোধিতা করেছেন সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র 'ব্যবস্থাপনার' স্তরে নামিয়ে এনে। সমীক্ষণের নিবন্ধে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহারজনিত ও শিল্পজাত জলদূষণ, উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষ ও সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তাকে খন্ডন না করেই প্রশ্ন তুলেছেন **"... কিন্তু তিন, চার ও পাঁচ নম্বর পয়েন্টের প্রসঙ্গ রাসায়নিক নির্ভর চাষ, বৃহৎ সেচ প্রকল্প ও সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি। প্রাবন্ধিকের আপত্তি শুধু এদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায়। উনি কি বিশ্বাস করেন সোভিয়েতের (সেটা স্টালিনের না তৎপরবর্তী তা পরিষ্কার নয়) ব্যবস্থাপনা থাকলেই তা জনকল্যাণকর হয়ে উঠত?"** তিনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এতই বিদ্বেষ পোষণ করেন যে বলেছেন **"কিন্তু সোভিয়েত মডেল (বা চিনের মডেল!) সমালোচিত হলেই আমাদের দেশে এখনো অনেকে খুব অভিমান করেন। এঁদের বোঝানো শক্ত, চিন বা সোভিয়েতের ত্রুটি আলোচনা করা মানেই মার্কস বা সাম্যবাদের বিরোধিতা করা নয়, বরং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বুঝবার ও প্রয়োগের এক নতুন চেষ্টা।"** এই বলে তিনি একটি ও সম্পর্কিত আরো বই পড়তে উপদেশ দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গগুলি জলসংকটের নিবন্ধে কোথাও নেই। তাই আমরা নিশ্চিত কেবল কৃষি নয় শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শিল্প-বিজ্ঞান-কৃষিকলা যে কোন বিষয় আলোচনা হলেই একই স্বতঃপ্রণোদিত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। তাঁর বিচারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল এক একটা 'মডেল'। যেমন সোভিয়েত 'মডেল', চিন 'মডেল'। সেই 'মডেল' চূর্ণ হয়ে গেছে তবুও **'আমাদের দেশে' 'এখনো'** এর পক্ষ নেওয়া হচ্ছে! আমরা আন্তরিকভাবে জানতে চাই বর্তমান 'পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা' যা মানবজাতিকে সামগ্রিক বিপর্যয়ের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে তার বিরোধিতায় তাঁর 'মডেল'টা কী? সেটা কি মজুরী-শ্রম ব্যবস্থার মধ্যেই বিরাজ করে বা করবে? তার শিক্ষাটাও তো আমাদের জানা দরকার। আর কৃষি ব্যবস্থার 'মডেল' সম্পর্কিত আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। আমরা দায়িত্ব পালন করবো।

সুরজিৎবাবু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন এবং তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও সাম্যবাদকে বুঝবার চেষ্টার কথা বলেছেন। সেই মার্কস যার জন্মের দুইশত বছর পরও **এখনো** বিভিন্ন মহাদেশে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমজীবী জনতা (তার সাথে ছাত্র-যুবরাও) সম্প্রতি আওয়াজ তুলেছেন **'হয় মার্কস নয় মৃত্যু'** – তাঁর (এবং এঙ্গেলস) রচিত কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটাই হল – **"এযাবৎ বিদ্যমান সমস্ত সমাজের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।"**

সুরজিৎবাবু যখন বলেনে "কৃষি প্রক্রিয়া আবহমানকাল ধরে **সমাজ নিয়ন্ত্রিত** ছিল। **সেই সমাজের কৃষি নীতি ছিল স্থানভেদে আলাদা অর্থাৎ কৃষি ক্যালেন্ডারের সমস্ত কিছুই (বীজ নির্বাচন, জমি নির্ধারণ, চাষ পদ্ধতি থেকে তার বন্টন-বিপনন পর্যন্ত) স্থানীয় / আঞ্চলিক জলবায়ু, মাটির চরিত্র ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বৈচিত্র্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও বিবর্তিত হয়ে এসেছে।"** পড়লে মনে হয় সামন্ত-ভূস্বামী-রাজাদের অস্তিত্বই নেই। খাজনা আদায় নেই। হিংস্র-বর্বর সামাজিক-অর্থনৈতিক দলন নেই। কৃষক আন্দোলন নেই! 'কেমন সুন্দর সেই দিন কাটাইতাম, আমরা! ভারতে সেই আবহমানকাল ধরে সামন্ত শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট কৃষকের, আদিবাসী (কৃষকের)দের শত শত রক্তস্নাত বিদ্রোহের ইতিহাস – সে নিয়ে গান-গাথা-কাব্য সবই মিথ্যে! এমন বস্তুবাদ অধ্যয়ন করলে বিনা দ্বন্দ্বেই তো স্বীকার করতে হবে বিপ্লবের পর রাশিয়া-চিন নয়, ভারতেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম ছিল! তার নাম 'সোভিয়েট' না হয়ে 'গ্রামরাজ' বা রামরাজ হলেই বা ক্ষতি কি? সবই তালগোল পাকিয়ে যায়!

কৃষিতে পুঁজিবাদী রূপান্তর ইউরোপে পুঁজিবাদের হাত ধরে

এসেছে। আমেরিকা মহাদেশ ইউরোপীয়দের কাছে আবিষ্কৃত হওয়ার পুঁজিবাদী পদ্ধতিতেই কৃষি উৎপাদন শুরু হয়েছে। এসবই কয়েক শতাব্দী আগের কথা। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। কিন্তু এর দ্বারা উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে অতুলনীয় মাত্রায়। কোন জানা ও নির্ভরযোগ্য তথ্য মতে ফ্রান্স থেকে অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা থেকে মেক্সিকো কোথাও কৃষি উৎপাদন বন্ধ্যা জমির কারণে তলানীতে এসে ঠেকেছে এমন আছে কি? বস্তুতঃ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন এমনকি সংস্কারও ব্যক্তি নিরপেক্ষ। তাই ডঃ স্বামীনাথন শয়তান আর ডঃ রাইচারিয়েকে দেবদূত বানিয়ে ভারতীয় কৃষির দায়িত্ব দিলে পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদনই হত না এমন লিখলে ভারতীয় কৃষির সংকট মুক্তির পথ হবে 'ফিরে চল্ পিছন পানে'! যাকে সুরজিৎবাবু বলছেন **সমান্তরাল গবেষণা**। এই সমান্তরাল গবেষকদের দ্বারা দেখানো পথেই তাঁর মতে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রকৃত বিরোধিতা। কিন্তু তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন **"কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা পত্রিকাগুলিতে এ ব্যাপারে কোন আলোড়ন নেই। কারণ গবেষণা জার্নালগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পেছন থেকে কৃষি কর্পোরেটেরা চালায়।"**

উনি ঠিকই বলেছেন এগুলি সমান্তরাল গবেষণা। সমান্তরাল মানে বিরোধী নয়। একই অভিমুখে গতি এমন দুটি বিকল্প পথ। সেজন্য পুঁজিবাদ উচ্ছেদের কোন ইঙ্গিতও এই গবেষণায় পাওয়া যাবে না। আর সরকারী-বেসরকারী-অসরকারী গবেষণাপত্রে বিকল্প চাষ (ধান-গম-আখ বাদ দিয়ে), বিকল্প পদ্ধতির চাষ (কম জলে-জৈব সার-জৈব কীটনাশক দ্বারা) নিয়ে গোছা গোছা গবেষনা রিপোর্ট বার হয়। বর্তমানে এসবই সহজলভ্য – চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয়। এই বিকল্প গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন কৃষিপণ্যের বাজার তৈরি হচ্ছে। তার উপযোগী সামাজিক-সাংস্কৃতিক-কৃষ্টিগত পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, কোটি কোটি মুনাফা হচ্ছে যা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

বিজ্ঞান মনস্ক কোন সামাজিক সমস্যায় ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করে না। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি খড়্গহস্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ৯ই জুলাই ২০১৯ আনন্দবাজার পত্রিকার জয়া মিত্র লিখিত উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধের সমালোচনা ঐ নিবন্ধেরই সমালোচনা মাত্র। তিলমাত্র ব্যক্তি বিদ্বেষ প্রসূত নয়। সুরজিৎবাবু সেই সমালোচনায় প্রচন্ড কূপিত হয়েছেন। সেটা তিনি হতেই পারেন। কিন্তু ঐ নিবন্ধের যে সমালোচনা সমীক্ষণ করেছে তার একটারও কোন জবাব দেননি। বরং তাঁর চিঠিতে তিনি ঐ বক্তব্যগুলোকেই সমর্থন করেছেন। নীতি আয়োগের উক্ত রিপোর্টের অব্যবহিত পরেই আনন্দবাজারের কোন নিবন্ধ যদি বিজ্ঞানসম্মত না হয় এবং জনমানসে ভুল বার্তা যায় (অবশ্যই সমীক্ষণের বিচারে) তবে তার বিরোধিতা করা আমাদের কর্তব্য। সে জন্য নিবন্ধকার কবে কী লিখেছেন ঐ বিষয়ে সেটা জানা পূর্বশর্ত হতে পারে না। ঠিক যেমন সমীক্ষণের কোন রচনার দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করার জন্য এই পত্রিকার সমস্ত অঙ্ক পাঠ করা শর্ত হয় না। প্রসঙ্গত আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওনার রচনা অধ্যয়ন করছি। দেশ পত্রিকায় সম্বন্ধিত রচনাও আমরা অধ্যয়ন করেছি। যার শিরোনাম **"আপো নারায়ণঃ"!** এছাড়াও সুরজিৎবাবু সমান্তরাল গবেষকদের অনেকের অনেক পুস্তক অবশ্য পাঠ্য বলে পড়ার দাবি জানিয়েছেন। এর মধ্যে যা অধ্যয়ন করা নেই তা নিশ্চিতভাবেই করা হবে এবং ভবিষ্যতে সমীক্ষণের পাতায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে আমরা দায়বদ্ধ। কিন্তু এসব গবেষণা গুরুত্ব পাচ্ছে না কারণ কর্পোরেটেরা জার্নাল চালায় এ আক্ষেপ তো থাকার কথা নয়। বাংলা সংবাদ মাধ্যম জগতে অন্যতম প্রধান কর্পোরেট সংস্থা আনন্দবাজারে জয়া মিত্রর নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ পায়। বিশিষ্ট গান্ধীবাদী পরিবেশবিদ, জলসংরক্ষণবিদ, গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন এর প্রাক্তন কর্তাব্যক্তি যমুনালাল বাজাজ পুরস্কার সহ বহু সম্মানে ভূষিত অনুপম মিশ্রজীর পুস্তক 'রাজস্থানকী বজত বুঁদে" তো ভারত সরকার NCERT পাঠ্যপুস্তকে একাদশ শ্রেণীতে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাঁর 'আজ ভী খড়ে হ্যায় তালাব' পুস্তকটি স্বয়ং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সুলভ মূল্যে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে। 'বিজ্ঞান মনস্ক' তথা 'সমীক্ষণ' এসম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ এমনটা স্থির নিশ্চয় হওয়া কি সঠিক? সুরজিৎবাবুর রচনাও আমরা অধ্যয়নের প্রয়াস রাখবো।

বৃষ্টিপাত ও বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গ ঃ সুরজিৎবাবু বলেছেন "জলসংকটের কারণ বৃষ্টি কমে যাওয়া এবং তার কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন" এমন সহজ সরল যুক্তি তিনি গুরুত্বপূর্ণ লেখাপত্রগুলিতে দেখেননি। ওটি আলোচনার যোগ্য মতই নয়। কিন্তু জনমানসকে প্রভাবিত করে এমন শয়ে শয়ে রচনায় (সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিনা বিশেষজ্ঞরা বিচার করতে পারেন) প্রতিবছর লেখা হচ্ছে বৃষ্টি চুরি'র কথা! তাদের জন্য তো লিখতেই হবে বৃষ্টিপাতও কোন এলাকায় স্থির নয়। পূর্বের মরুভূমি আজ সবুজ আবার উল্টোটাও সত্য। এমন বহু বহু উদাহরণ রয়েছে। তিনি লিখেছেন বৃষ্টির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ আমরা "আস্তে আস্তে জানতে পারছি।" আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি যে তিনি বলেননি ঐতিহ্যসম্পন্ন সমাজ নিয়ন্ত্রিত প্রাচীন কৃষিব্যবস্থায় অভ্যস্ত মানুষও ওয়াকার

চক্র, এল নিনো সাদার্ন অসিলেশন ইত্যাদি জানতেন। কারণ গুরুত্বপূর্ণ লেখায় এমনও তো বলা হয় **"এখনও গ্রামের দিকে আমি দেখেছি বয়স্ক মানুষরা পৌষমাসের সকালবেলা জঙ্গলের হিম দেখে বলে দিতে পারেন পরের আষাঢ়ে জল কেমন হবে।"**[৪]

বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে সুরজিৎবাবু বলেছেন এটা "মনুষ্য সৃষ্ট কিনা – তা নিয়ে হাল্কা একটি বিতর্ক আছে এবং পিছনে পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার প্রশ্রয়ও যথেষ্ঠ। ... ... তা নিয়ে হ্যাঁ বা না কোনোটাই নিশ্চিতভাবে বলার জায়গায় আমরা নেই ... কারণ সেই পরিমাণ তথ্যই তো আমাদের হাতে নেই।"

বিজ্ঞান মনস্ক বেশ কয়েকবছর হল বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য বিস্তারিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। তাই সে কি মত পোষণ করে তা অধ্যয়ন করা যায় (যোগ্য মনে হলে)। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তার বিরোধিতাও করা যায়। কিন্তু সে সব না করে একে **হাল্কা** বলা হয় কখন? বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে ওজন নাই নাকি ওজনদার-নামজাদা বিশিষ্টরা এর পক্ষে নন? দ্বিতীয় যুক্তিটা সত্য। স্বয়ং IPCC-র নেতৃত্বে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মাতৃদুগ্ধ এবং পেটখারাপের সাথেও মনুষ্যকৃত গ্লোবাল ওয়ামিং ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুনিয়াদী স্তরের পাঠ্যপুস্তক বোঝাই হয়ে রয়েছে মুনষ্যকৃত গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রচারে। সেখানে সংখ্যালঘু বৈজ্ঞানিক আর মামুলী কিছু বিজ্ঞানকর্মীর আওয়াজ তো হাল্কা মনে হবেই। সুরজিৎবাবু বলছেন নিশ্চিতভাবে বলার জায়গায় আমরা নেই কারণ তথ্যই হাতে নেই। আমাদের জ্ঞান মতে তত্ত্ব ও তথ্যের কোন ঘাটতি নেই। ভূতত্ত্ববিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ ফলিত বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের অনেক বিশেষজ্ঞ এবিষয়ে তথ্য-তত্ত্বসমৃদ্ধ অনেক পুস্তক-গবেষণাপত্র রচনা করেছেন। তবে এটাও সত্য যেIPCC এবং নামজাদা-বহুবিজ্ঞানী তাতে কর্ণপাত করেননি। বিশ্ব উষ্ণায়ন মনুষ্যসৃষ্ট নাকি নয় – এর কোন মতটি পুঁজিবাদী আর্থিক প্রশ্রয়ে আদিগন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তা বুঝতে সাদা চোখে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তবু এবিষয়ে আগামী বিতর্কের জন্য আমরা প্রস্তুত।

সুরজিৎবাবু বলেছেন "এখন পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি প্রাকৃতিক পদ্ধতিরই ফল – এমন ঘোষণার সম্ভাবনা আর মানুষের হঠকারিতায় এই ফল এমন ঘোষণার সম্ভাবনা একেবারে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।" তিনি নিশ্চিতভাবে বলার জায়গায় নেই, তথ্য নেই তবু পঞ্চাশ শতাংশ সম্ভাব্যতা নির্ণয় করলেন। তা হোক্। এরপর সেই পঞ্চাশ শতাংশ সম্ভাব্যতা নিয়ে 'আমাজনের আগুন লাগার' বা 'কিয়োটো প্রোটোকল' এ হস্তাক্ষর না করার নৈতিক সমর্থনকারী বলে বিদ্রুপ ছুঁড়ে দিলেন। আমরা আশ্চর্যও নই অভিমানাহতও নই। কারণ ইতিপূর্বে এই একই বিষয়ে নিজ মত পোষণ করার জন্য 'ডোনাল্ড ট্রাম্প লবির লোক' বলে আখ্যায়িত হবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যখন দেখি প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা স্বাক্ষরকারী বারাক ওবামা আর পরিত্যাগকারী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিকে একই পুঁজিবাদী 'ব্যবস্থাপনার' দুই কৌশল, একই লক্ষ্যে ধাবিত দুই সমান্তরাল ধারা বলে দেখতে অক্ষম হন কেন?

বিজ্ঞানের আলোকে জলাভাব (সংকট যেহেতু মিষ্টি-ব্যবহার যোগ্য জলের তাই জলদূষণও তার মধ্যে পড়ে) সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমুদ্র জল শোধন। এ বিষয়ে নিবন্ধের আলোচনাও সুরজিৎবাবুর উষ্মা উদ্রেক করেছে। প্রশ্ন তুলেছেন ভূমি ঢালের বিপরীতে পশ্চিমঘাট পাহাড় পেরিয়ে খরা পীড়িত বিদর্ভে জল নিয়ে যাবেন কী করে? এর বিপুল খরচ ধরলে **"সেই জলের ভর্তুকী বা দাম যেটাই হোক-কত দাঁড়াবে তা হিসেব করলেই বোঝা যায় সমুদ্র জল নিয়ে মাতামাতি কতটা অর্থহীন।"**

আমাদের সবিনয় জিজ্ঞাসা দাম আর ভর্তুকীর প্রশ্নটা কি সেই পুঁজিবাদী বাজার-কেন্দ্রীক, মুনাফা ভিত্তিক যুক্তি হল না? জলের অপর নাম জীবন। দেশের জনগণের সেই জীবন সংকটগ্রস্ত হলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সেই সংকট পরিত্রাণের দায়িত্ব নেওয়া। সেখানে দাম আর ভর্তুকীর প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? এবছরই তো দেশের মানুষ তুরস্ক-মিশরের পেঁয়াজ খেলো ১৪০-১৫০ টাকা কেজি দরে! তর্ক উঠতে পারে 'সে আর কদিন?' কিন্তু মেটিয়াবুরুজ থেকে রেডিমেড কাপড় প্যাকেট বন্দী হয়ে দিল্লী-মুম্বইতে বিক্রী হচ্ছে আবার দিল্লী-মুম্বই থেকে ঐ একই বস্তু কলকাতায় এনে বিক্রী করা হচ্ছে। সম্পদের এমন অপচয় তো নিরন্তর চোখের সামনে হয়েই চলেছে! ভয়ংকর 'দূষণ সৃষ্টিকারী' পেট্রোলিয়াম গুজরাট-মুম্বই-আসাম থেকে পাইপলাইনে সারা বছর ধরে গোটা দেশ জুড়ে শোধন-বিতরণের জন্য ছড়িয়ে পড়ছে! তার দাম আর ভর্তুকী তো জনগণই দেয়! যা হোক এ হল তর্কের যুক্তির প্রতিযুক্তি। **আসল কথাটা হল জলাভাব সমাধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে না।** সরকার বা বেসরকারী কর্তৃপক্ষকে শহরে বৃষ্টিজল সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা জল শোধণ ব্যবস্থা কার্যকরী না করলে শ্রমিকদের মজুরী প্রদানের দায়িত্ব সহ ফ্যাক্টরী সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হবে। ভূমি জলের এলাকাওয়াড়ি নিয়মিত অনুসন্ধানের জন্য

৪. ভূমিজল ঃ জয়া মিত্র পৃষ্ঠা-৯

কৃত্রিম উপগ্রহ সহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। ঘাটতি এলাকায় জল রিচার্জ করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। সমস্ত জলাধারের সংস্কার করতে হবে। নরমপানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থা দ্বারা জল উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। এরকম বহুবিধ ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি সমীক্ষণের নিবন্ধে নানাভাবে রাখা হয়েছে আবার অনেক অসম্পূর্ণতাও আছে। এসবকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে উচ্চ ফলনশীল সংকর বীজ-রাসায়নিক সার-কীটনাশক-জলসেচ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হবে? এই দাবির সারমর্ম বোঝা খুব কি কঠিন?

সে কথাটা উপসংহারে সুরজিৎবাবু লিখেছেন **"... উন্নত প্রযুক্তি মানেই সংগঠিত বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার মানেই পুঁজি মুনাফার ব্যবসা সর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। এমনকি সোভিয়েত-চিনও তাঁর ফাঁদ এড়াতে পারেনি। আপনার প্রাবন্ধিকেরও একই দশা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তিতে বিশ্বাস কখন যে অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়, বিশ্বাসী নিজেও তা জানতে পারেন না বেশিরভাগ সময়। কিন্তু তিনি কি তখনো বিজ্ঞানমনস্ক!"** সমীক্ষণ মনে করে জনস্বার্থে (জলের স্বার্থটাও জনস্বার্থ) সংকটের সমস্ত দায়িত্ব পুঁজিপতিশ্রেণী ও সরকারকে নিতে হবে। কারণ বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তারাই মালিকশ্রেণী। সুরজিৎবাবু পুঁজিপতিদের বা রাষ্ট্রের খরচ বা ভর্তুকী কত সেই হিসেব কষছেন। ফাঁদটা কাদের জন্য পাতা?

আবারো প্রযুক্তি প্রসঙ্গে সোভিয়েত-চিন 'মডেল' উত্থাপন যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তীব্র বিদ্বেষ এর বহিঃপ্রকাশ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। রাশিয়া ও চিনে বর্তমানে কী 'মডেল' চলছে সে নিয়ে ওয়াকিবহাল লোকের অজানা কিছু নেই। কিন্তু সুরজিৎবাবুর টার্গেট যে সময় ঐ দুটি দেশে শ্রমিকশ্রেণী শাসন ক্ষমতায় ছিল সেই সময়কাল। দুনিয়া জোড়া চারশো বছরের পুঁজিবাদকে ছাড় দিয়ে মাত্র চল্লিশ বছরের দুটো সেই যুগের বিচারে পশ্চাদপদ দেশ এবং তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টার্গেট করা কিসের পরিচয়? এমন বিদ্বেষ তো দুনিয়ার পুঁজিপতিশ্রেণী পোষণ করে? আর ভারতে যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে আস্থা রাখেন আজকে সংঘের শরণার্থীরা তাদের যে সমালোচনা করে এটাও কি বিপজ্জনকভাবে সেই অভিমুখে যাত্রা করে না?

কিন্তু সুরজিৎবাবু ঠিকই বলেছেন উন্নত প্রযুক্তি মানেই সংগঠিত বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থা। এর বিরোধী হল ক্ষুদ্র-অসংগঠিত-নিম্ন প্রযুক্তির উৎপাদন ব্যবস্থা। প্রকৃতি-জল-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সহ যা কিছু বাঁচানোর নাম করে সভ্যতার চাকাকে পিছন দিকে নিয়ে যাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামে বিভ্রম ছাড়া কিছুই সৃষ্টি করে না। তাই 'বিশ্বাসী' বলে গাল পাড়লেও বিজ্ঞান মনস্ক সেই মতাদর্শগত সংগ্রাম জারি রাখবে।

এই প্রসঙ্গে কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠেই আসে। এটাতো ঠিক উন্নত প্রযুক্তি, ব্যবস্থার মালিকশ্রেণী পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থকে চরিতার্থ করে। সেই যুক্তিতে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা (ধরুন বিমান-রেল), উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (টেলিভিশন-মোবাইল-ইন্টারনেট), সংগঠিত চিকিৎসা ব্যবস্থা (রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে 'রাসায়নিক' ওষুধ, শব্দেতর তরঙ্গ, রকমারী স্ক্যানিং, উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর অস্ত্রোপচার), আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থা, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণা, মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে ন্যানো প্রযুক্তি – সবই তো অত্যাধুনিক, উন্নত, বৃহদাকার, সংগঠিত এবং অতিমাত্রায় মুনাফাদায়ী। এবং এগুলির প্রত্যেকটার সাথে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও দূষণের সম্পর্ক আছে। শিল্প আর শক্তি উৎপাদনটা ইচ্ছে করেই বাদ রাখা হল। এসকলই কি আমাদের পরিহার করার জন্য বলা উচিত নয়?

পরিশেষে বলা যায় অজানাকে জানার জন্য সভ্যতার ঊষাকাল থেকে মানবজাতির অগ্রণীদের অক্লান্ত প্রয়াস এবং তাঁদের নিরন্তর গবেষনালব্ধ জ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। প্রযুক্তিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পূর্বজ। প্রযুক্তি নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করার যান্ত্রিক কৌশল। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ওতপ্রোত। এটা প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক – সকল ক্ষেত্রেই সত্য। প্রতিটি যুগেই সেই সমাজের উপযোগী প্রযুক্তি বিদ্যমান ছিল। এবং বিজ্ঞানীকূল বিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কারকে কার্যকরী করার জন্য নব নব প্রযুক্তির সন্ধানে ব্রতী ছিলেন। অতএব উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তির জন্য পুঁজিবাদকে অপবাদ দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত নয়।

দ্বিতীয়তঃ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা অতীতের ধারাবাহিকতা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শূন্য থেকে শুরু হয়নি। কৃষিবিদ্যা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, নির্মাণশৈলী থেকে জলসংরক্ষণ – প্রতিটি শাখা যুগ যুগ ধরে অধীত বিদ্যা ক্রমাগত প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট সমাজে সেই সমাজের মালিকশ্রেণী (যেমন বর্তমানে পুঁজিপতিশ্রেণীর) দ্বারা তাদের স্বার্থে (এ ক্ষেত্রে মুনাফার স্বার্থে) নিয়ন্ত্রিত হলেও তার বিকাশ ঐ সমাজের ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায় বা যাবে। সাথে সাথেই তাকে ধারণ করার উপযোগী সমাজ নির্মাণের সংগ্রামও শুরু হয়। এ পর্যন্ত মানব সমাজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এভাবেই অগ্রসর হয়েছে। আগামী দিনেও তার বিরাট বিপরীত যাত্রার কোন সম্ভাবনা নেই।■

পাঠকের কলাম ঃ

অন্ধ কুসংস্কার নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোকপ্রাপ্ত পথিকৃত পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত

– অভিনন্দন পড়িয়া
মেডিকেল কলেজ কলকাতা, ৩য় বর্ষ

তারিখটা ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি, সামাজিক অন্ধ-কুসংস্কারের ওপর কুঠারাঘাত করে, ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান এক ধাক্কায় এগিয়ে গেল কয়েক বছর, একজন বাঙ্গালী চিকিৎসকের হাত ধরে – পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, প্রথম ভারতীয় শব-ব্যবচ্ছেদকারী।

পড়াশুনা ঃ ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে শুরু হয় মাত্র ৮ জন ছাত্র নিয়ে মেডিকেলশ্রেণী। এদের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। ক্ষুদিরাম বিশারদের কাছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন এবং কয়েক বছর পরই পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। অবশ্য শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞান নয়, সংস্কৃতেও পারদর্শী ছিলেন তিনি। যার দরুন তাঁকে কবিরত্ন বলে সম্ভাষণ করা হত। মেডিকেল ক্লাসে ডাক্তার জন টাইলারের থেকে তিনি এনাটমি শিক্ষা নেন।

অবশ্য তাঁর প্রতিভার কথা এখানেই শেষ করলে অন্যায় হবে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর শিক্ষক ক্ষুদিরাম বিশারদ শারীরিক কারণে শিক্ষকতা স্থগিত করেন, তখন মধুসূদন গুপ্ত সেই ক্লাসের ছাত্র হয়েও সেই ক্লাসের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। অবশ্য এই নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, এবং অনেক বৈদ্য ছাত্র তার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে অস্বীকার করে এবং কলেজ ছেড়ে দেয়। অবশ্য সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সচিব এক চিঠিতে লেখেন ঃ "Under these circumstances, the secretary would recommend that Madhusudan Gupta, the head student of class ... always had charge of the class in the absence of his principal, and who is in every respect highly qualified for the situation, be nominated Medical Pundit in the room of Khoodeeram..."

প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন মতভেদ থাকলেও সামগ্রিক বিচার করে দেখা যায় ১০ই জানুয়ারি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিত মধুসূদন গুপ্তের হাত ধরেই মেডিকেল কলেজে এবং ভারতে

পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত

শব-ব্যবচ্ছেদ শুরু হয়। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মেডিকেল কলেজে মধুসূদন গুপ্তের এক তৈলচিত্র উন্মোচনের সময় প্রথম ডিসেকশনেরর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ "... having once taken his resolution, he never flinched or swerved from it. At the appointed hour with a scalpel in hand, he followed Dr Goodeve into the Godown where the body lay ready ... And when Madhusudan's knife held with strong and steady hand, made a long and deep incision in the breast the lookers-on drew a long grasping breath like men relieved from the weight of some intolerable suspense"

ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান এক নতুন দিশা খুঁজে পেল, কিন্তু এই অভূতপূর্ব ঘটনার কোনো টাটকা খবর বেরোয়নি, সরকারি নথিতেও অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। আসলে শব-ব্যবচ্ছেদকারী ব্যক্তি সমাজে অচ্ছুৎ হয়ে যেতে পারেন, তাঁর

পরিবারকে এক ঘরে করে দেওয়া হতে পারে, এমনকি সমাজের গোঁড়া হিন্দুদের থেকে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কাও ছিল। তাই এত সাবধানতা। জনশ্রুতি আছে যে এই দিনটিকে স্মরণীয় রাখতে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কয়েকবার তোপধ্বনি করা হয়, কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার দরুন এই জনশ্রুতির সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে।

মেডিকেল কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য একটি ছোট ঘর তৈরি করা হয়েছিল যার দেওয়ালগুলি যথেষ্ট উঁচু ছিল, ছাদ লোহার তৈরি আর মেঝে আসফল্ট দিয়ে। এই ঘরেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর-এর সাহায্যে একটি বেওয়ারিশ পুরুষ মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়। মধুসূদন গুপ্ত, ডঃ গুডিভ এর সাহায্যে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন, এবং এরপরে এই ঘরেই ঐ বছরই ২৮শে অক্টোবর মধুসূদন গুপ্তের সাহায্যে তাঁর ছাত্র রাজকৃষ্ণ দে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। ধীরে ধীরে সংস্কার কাটিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ চলতে থাকে, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে মোট ২৩১৬টি শব-ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

সমাজের প্রতিক্রিয়া ঃ সমাজ কখনই এই ঘটনাকে ভালো চোখে দেখেনি। এই অবস্থা যে হবে তা পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত আগেই অনুমান করেছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্র, চরক এবং সুশ্রুতের রচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানতেন প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে মানুষের শব-ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলা আছে। মৃত দেহ-ব্যবচ্ছেদ নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। মারমুখী জনতা যাতে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য মৃত দেহ-ব্যবচ্ছেদ করার ঘরটিকে পুলিশী পাহারায় রাখা হত। ক্ষুব্ধ জনতা প্রায়ই দেওয়ালের বাইরে থেকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ত। মেডিকেল কলেজের বদনাম করার জন্য গুজব ছড়ানো হত যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অপহরণ করে ও অসুস্থ রোগীদের খুন করে ব্যবচ্ছেদের জন্য মৃতদেহ জোগাড় করা হয়। এমনকি মধুসূদনকে সমাজে জাত খোয়াতে হয়েছিল। এতটাই আলোড়ন ওঠে যে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সূরধনী কাব্য' গ্রন্থটির দ্বিতীয়ভাগের দশম সর্গে তাঁকে নিয়ে লেখেন –

"দেয়ালে রহেছে মধু ছবিতে চাহিয়ে,
শিখেছিল এনাটমি আগে জাত দিয়ে।"

অবশেষে জে.ই.ডি.বেথুনের হস্তক্ষেপে লিউটেনেন্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল এক বিতর্কসভার আয়োজন করেন। এই সভায় হিন্দু শাস্ত্রীয় পন্ডিতদের সামনে মধুসূদন গুপ্ত প্রমাণ করেন যে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র এবং প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রেও শব-ব্যবচ্ছেদের কথা বলা আছে। সুন্দরীমোহন দাস বলেছেন রক্ষণশীল নেতাদের উপর মধুসূদনের বিজয়ের জন্য তাঁর শাস্ত্র জ্ঞান দায়ী।

শিক্ষক মধুসূদন গুপ্ত ঃ মেডিকেল কলেজে মধুসূদন গুপ্তের জন্য আলাদা একটি পদ ছিল "পন্ডিত" বলে। কয়েক বছর পরে তাঁর পদটি হয় "Native Demonstrator of Anatomy"। তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী তো ছিলেনই, সাথে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাই তাঁকে দরকার পড়েছিল মেডিকেল কলেজের গোড়ার দিকে ইংরেজি অল্প জানা মেডিকেল ছাত্র এবং সাহেব শিক্ষকদের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের জন্যে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে মেডিকেল কলেজে মূল বিভাগের সাথে শুরু হয় সেকেন্ডারি বিভাগ বা মিলিটারি শ্রেণী। ১৮৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে মিলিটারি শ্রেণীর সুপারিটেন্ডেন্ট করেন। মূল শ্রেণীতে এনাটমি শিক্ষক হবার পাশাপাশি বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে মিলিটারি শ্রেণীতে এনাটমি ও সার্জারির শিক্ষক হিসেবেও নিযুক্ত হন। পরে মেডিকেল কলেজে বাংলা বিভাগ শুরু হলে তিনি ঐ বিভাগের এনাটমি শিক্ষক এবং সুপারিটেন্ডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি নিজে তখনও প্রথাগতভাবে পাশ্চাত্যধারার ডাক্তার ছিলেন না। যদিও এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। তাও ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ সুনামহানির আশংকায় তাঁকে চলতি বছরের চূড়ান্ত পরীক্ষার্থীদের সাথে পরীক্ষায় বসতে অনুরোধ করেন। তিনি পারদর্শীতার সাথে চূড়ান্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থের ১৪ নম্বর পাতার নিচে লেখা আছে ঃ " Pandit Madhusudan Gupta was never a student of the newly formed Medical college, though he was given a full certificate of qualification signed by the assessors, examiners and teachers in 1840"

বই রচনা ঃ নিজে পড়াশোনার এবং শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বেশ কিছু বই লেখেন এবং বেশ কিছু অনুবাদও করেন। তিনি অ্যানাটমিস্টস ভাদেমিকাম, হুপারস ভাদেমিকাম, লন্ডন ফার্মকোপিয়া-বইগুলির অনুবাদ করেন। দুটি খন্ডে তিনি লেখেন "Susruta, or System of Medicine" ।তিনি বাংলা ভাষায় লেখেন "চিকিৎসা সংগ্রহ" এবং "এনাটমি, শরীর বিদ্যা"।

মধুসূদন গুপ্তের জনস্বাস্থ্য ভাবনা

মধুসূদনের আমলে দেশীয় চিকিৎসকদের সামগ্রিক ভাবে

চিকিৎসা সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা তাঁর মত সুদূর প্রসারী ছিল না। তিনি ব্যক্তি চিকিৎসার সাথে সাথে জনস্বাস্থ্যের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি, খাদ্য-পরিবেশ মানুষের স্বাস্থ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, অস্বাভাবিকতা-অস্বাস্থ্যকর অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর লক্ষ্যই ছিল যুগপৎ জনস্বাস্থ্যকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা এবং হরেক অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো।

তিনি মাসে দু-তিনবার কোলকাতা থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে তাঁর গ্রাম বৈদ্যবাটিতে যেতেন। ছুটি পেলে ছুটি অনুযায়ী তিনি সেখানে দুই-তিন দিন বা একসপ্তাহ থেকে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্র্যাকটিস করতেন।

তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে তিনি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ টাউন হলে ফিভার হাসপাতাল কমিটির কাছে প্রসূতি এবং শিশুদের অসুবিধা সংক্রান্ত এক ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন। তিনি সেখানে নিকাশী ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে স্বাস্থ্যমানের যোগসূত্র সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি তৎকালীন নবজাতক এবং প্রসূতি মৃত্যুর জন্য আঁতুড় ঘরগুলির অবস্থাকে দায়ী করেন এবং তিনি একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের হিন্দু ধাত্রীযুক্ত হাসপাতালের আবেদনও করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে তৈরি হয় বিরাট প্রসূতি হাসপাতাল।

এছাড়াও ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গুটিবসন্তের টীকাকরণ কমিটিরও তিনি একজন অংশ ছিলেন।

গবেষণায় পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ঃ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের সময় থেকে, মেডিকেল কলেজে উজ্জ্বল শিক্ষকতার সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, মধুসূদন গুপ্ত একজন নিরলস গবেষক ছিলেন। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মধুসূদন গুপ্ত রোগের কারণ খোঁজার চেষ্টা করে গেছেন সবসময়। মেডিকেল কলেজে ব্যবচ্ছেদ কক্ষে দিনের অনেকটা সময় কাটাতেন তিনি। ডঃ অ্যালানওয়েব-এর "Pathologia Indica or the Anatomy of Indian Disease" বইটিতে ১৮৪৬-১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ব্যবচ্ছেদ সিজনে আনা ৪৬০টি শবদেহ মধুসূদন ব্যবচ্ছেদ করে সম্ভাব্য রোগগুলি নথিভুক্ত করেন। প্রায় ৮ রকম ভাগে ভাগ করা হয় কারণগুলিকে।

মধুসূদন গুপ্ত ৫০ জন দেশীয় মহিলা মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করে তাদের জননতন্ত্রের অবস্থা নথিভুক্ত করেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের The Landon Loncel পত্রিকায় এই বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি মহিলা জননতন্ত্রের প্রতিটি অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বসন্ত রোগ সম্পর্কিত অনুসন্ধান চালানোর জন্য তৎকালীন সরকার একটি কমিটি তৈরী করেন। ঐ কমিটিতে দেশীয় চিকিৎসক একমাত্র মধুসূদনই ছিলেন। ঐ কমিটির কাছে মধুসূদন গুপ্ত দেশে ইউরোপীয় টিকাকরণ – দেশীয় টিকাকরণের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেন।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ডা. ওশনেশী অবিরাম এবং সবিরাম জ্বরের ওপর গবেষণাপত্র বার করেন। এই কাজে মধুসূদন গুপ্তও তাঁকে সাহায্য করেন।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মেয়েদের রজস্রাব, যৌবনারম্ভ, বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে জন রবার্টসন-এর গবেষণাতে নিজস্ব গবেষণালব্ধ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন মধুসূদন। রবার্টসনের মূল গবেষণাপত্রের সাপ্লিমেন্টের মধ্যে তাঁর অসাধারণ গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় "On Menstruation among Hindu females" শিরোনামে।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে। জানা যায় তিনি ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। বলাবাহুল্য সেই সময় ডায়াবেটিসের কোন ওষুধ ছিল না। শব-ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে তাঁর হাতে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে এবং ভয়ংকর ডায়াবেটিক গ্র্যাংগ্রিনের ফলে তার মৃত্যু হয়। তার কীর্তিকে অক্ষয় রাখতে মাদাম বেলনেস-এর অঙ্কিত মধুসূদন গুপ্তের একটি তৈলচিত্র উদ্ধোধন করা হয়।■

[তথ্যসূত্র ঃ পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত – ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথ এবং ইন্টারনেট মাধ্যমের তথ্যাবলী]

যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় সংক্রমণ পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

কোয়ারানটাইনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

রোগ প্রতিরোধে জনগণকে সুষম খাদ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ

***১লা নভেম্বর ঃ** রেনসেসলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট জীবন্ত ত্বকের ত্রিমাত্রিক প্রিন্ট করে দেখালো। এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানে কাজে আসছে।

***৪ঠা নভেম্বর ঃ** ভয়েজার ২ প্রোব সৌরজগতের বাইরে চলে গেল।

***৬ই নভেম্বর ঃ** রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সুপার হাইড্রোফোবিক ধাতুর সৃষ্টি করল যা জলে ভাসতে সক্ষম।

***১১ নভেম্বর ঃ** বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষ পর্যায়ে (আধুনিক সাড়ে ৬ কোটি বছর আগে) পৃথিবী জুড়ে যে প্রবল উল্কাপাত হয়েছিল, যার ফলে পক্ষীসুলভ বাদে অন্য ডায়নোসরগুলির অবলুপ্তি হয়েছিল, সেই উল্কাপাত শুরুর আগে সমুদ্রের জলের CO_2 মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। এটা ঘটেছিল সেই সময়কার ধারাবাহিক অগ্নুৎপাতের ফলে (ডেকান ট্র্যাপ ভলকানিশম) যা উল্কাপাতের আগেই ঘটেছিল। এই গবেষণা করা হয়েছে প্রস্তরীভূত সামুদ্রিক অমেরুদন্ডী প্রাণীর খোলক (শামুক, ঝিনুকের খোলা) এর ক্যালসিয়াম থেকে। এই আইসোটোপ পদ্ধতি মনুষ্যজনিত কারণে বাতাসে CO_2 এর মাত্রা বৃদ্ধির হিসাব করতে সাহায্য করবে। [সূত্র ঃ নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির দ্বারা প্রকাশিত নিবন্ধ]

***১২ই নভেম্বর ঃ** নাসা আলটিমাথুলির অফিশিয়াল নামকরণ করল 486958 Arrokoth।

***৩রা ডিসেম্বর ঃ** বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল কৃত্রিম নিউরন (নার্ভ কোষ) তৈরি করল। (সূত্র ঃ দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ ঃ বাওনিক নিউরন কুড এনেবেল ইমপ্ল্যান্টস টু রেস্টোর বোইলিং ব্রেন সার্কিট)

***২রা ডিসেম্বর ঃ** তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি অণুর সন্ধান দিয়েছেন যা কিনা প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসার কোষকে এই সক্ষমতা দেয় যাতে কিনা সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতে পারে। মানুষের শরীরের পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৯০% ক্যানসার কোষের ধ্বংস হয়েছে। এই গবেষণা প্যানক্রিয়াটিক মারণ ক্যানসারের একটি উপযুক্ত চিকিৎসা হতে পারবে।

***৫ই ডিসেম্বর ঃ** 'ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাকাডেমি অফ সাইন্স' ৭১টি নতুন উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতির সন্ধান দিল।

***৯ই ডিসেম্বর ঃ** চীনা বিজ্ঞানীরা একটি শূকর ছানার জন্ম দিল যার মধ্যে হনুমানের ডিএনএ উপস্থিত। এটা হল প্রাণীজগতের একটি হাইব্রিড যেখানে উভয়প্রাণী আলাদা প্রজাতির। (সূত্র ঃ লাইভ সাইন্স)

***১০ই ডিসেম্বর ঃ** নাসার বিজ্ঞানীরা জানালো যে যথেষ্ট পরিমাণে জলের বরফ রয়েছে মঙ্গলগ্রহের উপরিস্তরের নীচে।

***১১ই ডিসেম্বর ঃ** ইন্দোনেশিয়ার মধ্যভাগে ৪৩,৯০০ বছরের পুরানো গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হল। (সূত্র ঃ নিউ ইয়র্ক টাইমস্)

***১৮ই ডিসেম্বর ঃ** 'CHEOPS' নামক টেলিস্কোপটি কাজ শুরু করলো, এটি এই সৌরজগতের বাইরের। গ্রহের ব্যাস, ঘনত্ব, অভ্যন্তরীণ গঠন পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হবে।

*বিজ্ঞানীরা রিপোর্ট করেছেন যে হোমো ইরেকটাস হল বিলুপ্ত আরকাইফ মানুষের একটি প্রজাতি যা কিনা বেঁচে ছিল এক লক্ষ বছর আগে। পূর্বের অনুমান এর থেকে কম ছিল। বিজ্ঞানী পল রিনকম বিবিসি নিউজের নিবন্ধে এই তথ্য দিয়েছেন।

***২৬শে ডিসেম্বর ঃ** আংশিক সূর্যগ্রহণ হল এই দিন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে গিয়ে এই সূর্যগ্রহণ পরিদর্শন করলেন। তাদের এই পরিদর্শন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে লাগবে।

যদিও এই দিন পৃথিবীর বহু মানুষ (যেমন ভারতে) কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে কাটালেন।

***২৮শে ডিসেম্বর ঃ** নাসা জানালো মহাকাশচারী ক্রিসটিনা কক আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ২৮৯ দিন কাটালেন, মহিলা মহাকাশচারীদের ক্ষেত্রে এটি দীর্ঘতম রেকর্ড।

***৩০শে ডিসেম্বর ঃ** চীনা সরকার বিজ্ঞানী হে জিয়ানকুইকে প্রথম জেনেটিকালী এডিটেড মানব শিশুর জন্ম দেওয়ানোর পর বিশেষ কারণে তিন বছরের জেল ও তিন মিলিয়ন উয়ান ফাইন করল। এই ঘটনা বিজ্ঞানী মহলে বিতর্ক তৈরি করেছে।

২০২০, ১লা জানুয়ারী

গুগুল সংস্থার একটি আর্টফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স (এআই) কোম্পানি 'ডিপ মাইন্ড অ্যালগোরিদম' ম্যামোগ্রাম স্ক্রিনিং-এর ক্ষেত্রে এমন সুক্ষ্মতা এনেছে যে তাতে সাধারণ অবস্থায় যে ব্রেস্টক্যানসার মহিলাদের শরীরে ধরা পরে না, তা এই (এআই) দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব হল।

●*শেষাংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

সমাজ দর্পণ ঃ

বৈষম্য, বিভাজন ও উৎপীড়ন – বিজ্ঞান তথা মানবতার বিরোধী

– চন্দন সেন

সাধারণভাবে বস্তুজগতের (যার মধ্যে প্রকৃতি-পরিবেশ এবং মানব সমাজও অন্তর্ভুক্ত) নিয়মগুলিকে জানা এবং সেই জ্ঞানকে মানব প্রগতির স্বার্থে ব্যবহার করাই বিজ্ঞান। যেহেতু মানব সমাজ অখন্ড নয়, বরং পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত, সেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, গবেষণার বিষয়বস্তু, তার ব্যয়ভার এবং খোদ প্রগতি সম্পর্কেই পরস্পরবিরোধী মতামত-কার্যকলাপ ও গতিবিধি দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কণাজগৎ থেকে মহাবিশ্বর বিজ্ঞানের প্রতিটা বিভাগ-বিষয়-শাখা সার্বিক ও সামগ্রিক হলেও, – শ্রেণী বা অন্য যে কোন ধরনের বিভাজন নিরপেক্ষ হলেও – তার প্রয়োগ নির্দিষ্ট সমাজ দ্বারা, সমাজের আধিপত্যকারী শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানব সমাজের 'ঐতিহাসিক' যুগে বিজ্ঞান এর বিকাশ এভাবেই হয়ে চলেছে। সমাজ বিকাশের নিয়ম নিজেই এক বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানকে সার্বিক ও সামগ্রিক করার সংগ্রাম সমাজ বিজ্ঞানের মৌলিক দিক। সমাজ বিজ্ঞান মূলত অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ও তারই কেন্দ্রীভূত রূপ রাজনৈতিক বিজ্ঞান রূপে চর্চিত হয় এবং কার্যকরী হয়। সুতরাং বিজ্ঞান রাজনীতি নিরপেক্ষ নয় বরং ভীষণভাবেই রাজনৈতিক। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরাও শিল্পী-সাহিত্যিক-ছাত্র-যুব-মজুর-কৃষকদের মত রাজনৈতিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন।

বর্তমানে ভারতজুড়ে অসমের নাগরিকপঞ্জীকরণ (NRC), তারপর নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA) এবং আসন্ন জনসংখ্যার পঞ্জীকরণ (NPR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে উত্তাল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে তথা বজায় রাখা হচ্ছে, সে বিষয়েও বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী মহলে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে রসায়নে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী ভেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণণ এপ্রসঙ্গে বৈষম্যের বিরুদ্ধে মতামতকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন **"ইতিহাস বলে যে যখনি আপনি কম উন্মুক্ত এবং বৈষম্যমূলক হতে শুরু করেন তখন হয় বিজ্ঞানের ক্ষতি; এবং এর নিখুঁত উদাহরণ অবশ্যই নাৎসী জার্মানি। সম্ভবত দুই বা তিন প্রজন্মের জন্য জার্মান বিজ্ঞানকে ধ্বংস করেছিল। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে লেগেছিল আরো পঞ্চাশ বছর। ..."**

সমাজ বিজ্ঞান বর্তমান সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজরূপে নির্দিষ্ট করেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে সামন্ত সম্রাট আর গির্জার (ইউরোপে) সেবাদাসরূপে বিজ্ঞানের পায়ে যে বেড়ি বাঁধা ছিল তাকে মুক্ত করা ছিল পুঁজিবাদ ও তার ধারক পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রয়োজন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় ভূখন্ডে বস্তুবাদী দর্শন এবং বিজ্ঞান রাজা ও ধর্মাধিকারীদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে, ঠিক যেভাবে ব্রুনোকে শহীদ হতে হয়েছে। কোপার্নিকাস-গ্যালিলিও নিষ্পেষিত হয়েছেন। পুঁজিবাদ মুনাফার যে সীমাহীন লক্ষ্য দ্বারা চালিত হয় তার প্রয়োজনে নতুন বাজার-নতুন ক্ষেত্র-নতুন পণ্য-নব প্রযুক্তির দুনিয়াজোড়া প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তাকে গড়ে তুলতে হয়। সে কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনন্য বিকাশ ঘটেছে কমবেশি গত তিনশো বছরে। একেই তথাকথিত উন্মুক্ত সমাজ বলে। 'উন্মুক্ত' পুঁজিবাদী সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চালিত হয় আজকের ও আগামীদিনের মুনাফার ক্ষেগুলিকে উন্মুক্ত করার জন্য। তাই উন্মুক্ত সমাজ সৃষ্টি করে চলেছে চরম থেকে চরমতর বৈষম্য। পূর্বে বিজ্ঞানের যে নব-নব আবিষ্কারের সুফল মানবজাতির করায়ত্ব ছিল না আজ তা মুষ্টিমেয় ধনাঢ্যদের করতলগত। কিন্তু কোটি কোটি মানবসন্তান সেসব থেকে, এমনকি অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান থেকেও বঞ্চিত।

বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নত স্তরে মানবজাতির বিপুল অংশের চরম দুর্দশার কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যেই নিহিত আছে, অন্য কোথাও নয়। সমগ্র সমাজ যে বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করছে, তার ৯৯% কেবলমাত্র ১% বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। অকল্পনীয় বৈষম্য বিজ্ঞান তথা মানব সমাজের ভবিষ্যৎকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার ব্যবহৃত হচ্ছে ওষুধ আর রোগ নির্ণয়যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাতাদের মুনাফার প্রয়োজনে। জিন গবেষণা মারণ জৈব অস্ত্র প্রস্তুতিতে কাজে লাগছে। মহাকাশ গবেষণা মুখ্যত কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ দ্বারা বিক্রয়যোগ্য দূরসঞ্চার-আবহাওয়া সতর্কীকরণ ব্যবসায় প্রযুক্ত হচ্ছে। সর্বোপরি পরমাণু বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রায় প্রতিটি শাখা ব্যবহৃত হচ্ছে নিত্য নতুন যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কাজে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রের মৌলিক গবেষণা থেকে মুনাফার উদ্দেশ্য এবং সম্ভাবনা যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তবে তা মানব কল্যাণের সার্বিক ও সামগ্রিক লক্ষ্যে বহুদূর অগ্রসর হতে পারে। ঠিক সেই কারণে মুনাফার আশু সম্ভাবনা, কম বা দীর্ঘ সময়ের বিষয় বিজ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষার এমন প্রতিটি ক্ষেত্র প্রায় সমস্ত দেশে অর্থাভাবে ধুঁকছে। ছাত্র-গবেষক-শিক্ষকদের সংখ্যা ও সুযোগ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

উপরোক্ত ক্রিয়ার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে সমগ্র দুনিয়ায় ছাত্র-যুব-কৃষক-মজুর-বিজ্ঞানী-গবেষক ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজির শাসন ও তার প্রতিটি বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে চাইছেন। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে চাইছেন সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মে। এখানেই আসে শাসকপক্ষের ঐতিহাসিক কাল জুড়ে বিভাজন ও উৎপীড়নের বাস্তব প্রয়োজন। পুঁজিবাদী যুগের বর্তমান স্তরে বিভাজন ও উৎপীড়নের নগ্নতম রূপকে ফ্যাসীবাদ নামে অভিহিত করা হয়। যেখানে 'উন্মুক্ত' সমাজের সুন্দর সজ্জা ভেদ করে তার নগ্ন-হিংস্র শরীর বার হয়ে আসে। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-ভাষা-আঞ্চলিকতা-চামড়ার রং-বাপ-ঠাকুর্দার ঠিকানা সহ যে কোন কিছুকে শত্রু চিহ্নিত করো! প্রচার মাধ্যমের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য ব্যবহার করে তাকে সত্যে পরিণত করো! অতঃপর আক্রমণ চালাও! ক্রমশ নতুন থেকে নতুন শত্রু নির্মাণ করো! প্রতিবাদীদের নিকেশ করো! ঠিক অংকের ফর্মুলার মতো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী ইতালি ও জার্মানীতে একইভাবে জাতীয়তাবাদী এবং রাষ্ট্রদম্ভ প্রচার দ্বারা, জনগণের নামে-রাষ্ট্রহিতের নামে, অরাজকতা দূর করার নামে, শক্তিশালী সরকার গঠনের নামে যে অভিযান শুরু হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত দুনিয়াজুড়ে ব্যাপক-বিস্তৃত নরহত্যার সকল পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তথাকথিত 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী' উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির ইতিহাসও মাথায় রাখতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আত্মসমর্পণ করার পরও শত্রুরাষ্ট্র জাপানের 'হিরোসিমা' 'নাগাসাকি'তে 'বিজ্ঞানের' যে প্রয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছিল তা কি নাৎসীদের থেকে কোন অংশে কম কিছু? সুতরাং উন্মুক্ত হোক অথবা বদ্ধ, পুঁজিবাদ মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। ভারতে নাগরিক চিহ্নিতকরণের নামে, সুললিত বাক্যবাণী প্রচার করে দেশভক্তির নামে শত্রু চিহ্নিতকরণের যে প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করা হয়েছে তা এক দূরপ্রসারী বিভাজন ও উৎপীড়নের সুস্পষ্ট বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী যাঁরা বিজ্ঞানের সার্বিক ও সামগ্রিক ভূমিকা দাবি করেন তাঁদেরও কর্তব্য দাঁড়ায় সমাজের অন্য অংশগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উৎপীড়ন বিভাজন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান সোচ্চারে ঘোষণা করা ■

●২৩ *পৃষ্ঠার পর* **_বিজ্ঞানের খবর_**

এর আগে চোখের ও গলার ক্যানসার সনাক্তকরণে এই কোম্পানির (এআই) ব্যবহৃত হয়েছে।

***৬ই জানুয়ারী ঃ** নাসা একটি পৃথিবীর আকারের গ্রহের (exo planet) সন্ধান দিল, যার নাম T01 700d। 'ট্রানসিটিং এক্সোপ্ল্যানেট সারভে' নামক উপগ্রহ (টেস) এই আবিষ্কার করেছে। (তথ্যসূত্র ঃ ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি)

*চীনা প্যাডেলফিস নামক মাছটিকে বিলুপ্ত প্রাণী বলে ঘোষণা করা হল। এই মাছটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় তেইশ ফুট। সিএনএন নামক দূরদর্শন চ্যানেল থেকে ঘোষণা করা হল। এই প্রাণীটি নিম্ন জুরাসিক যুগের ২০০ মিলিয়ন বছর আগেকার প্রাণী।

***১০ই জানুয়ারী ঃ** চীনা বিজ্ঞানীরা নভেল করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলের কাছে প্রকাশ করলো।

***১৩ই জানুয়ারী ঃ** বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর এখনো পর্যন্ত প্রাচীনতম বস্তু খুঁজে পেলেন। যার বয়স ৭ বিলিয়ন বছর। (তথ্যসূত্র ঃ লাইভ সাইন্স পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ – 'সেভেন বিলয়ন ইয়র ওল্ড স্টারডাস্ট ইজ ওল্ডেস্ট মেটেরিয়াল ফাউন্ড অন আর্থ')

***১৫ই জানুয়ারী ঃ** প্রোক্যারিওটিক (আদি) ক্ষুদ্র জীব ও ইউক্যারিওটিক জীবের মধ্যবর্তী অ্যাসগার্ড আরচারা (Asgard archara) নামক ক্ষুদ্র জীবাণুর (micro organism) এর সন্ধান পাওয়া গেল। এটি দুই বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। (তথ্যসূত্র ঃ নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা)

***১৬ই জানুয়ারী ঃ** ৬৬ মিলিয়ন বছর আগে ডাইনোসোরের বিলুপ্তির কারণ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত নয়। এটা meteorite impact-এর ফলশ্রুতি, জানালো বিজ্ঞানীরা। এই খবর প্রকাশিত হচ্ছে ১৭ই জানুয়ারীর নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায়।

***২১শে জানুয়ারী ঃ** নতুন একটি পোকা প্লাম্ড মথের প্রজাতি (Plumed moth) আবিষ্কৃত হল।

***২২শে জানুয়ারী ঃ** চীন চ্যাঙ-ফোর ল্যান্ডার ও রোভার থেকে চাঁদের হাই রেজোলিউশন ছবি পাঠালো।

***২৩শে জানুয়ারী ঃ** মন্টপেরিয়ার ক্যানসার রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর গবেষকরা রক্তের মধ্যে মাইটোকনড্রিয়ার অস্তিত্ব খুঁজে পেল। সাধারণত মাইটোনড্রিয়া কোষের ভিতরে পাওয়া যায়। যাকে কোষের 'পাওয়ার হাউস' বলা হয়। এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে 'নিউ অ্যাটলাস' পত্রিকায়।

***২৭শে জানুয়ারী ঃ** ডাইনোসোরের একটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হল। (সূত্র ঃ সাইন্স নিউজ)

সমাজ দর্পণ ঃ

ওরা গরীব এটাই ওদের সবচেয়ে বড় অপরাধ !

– নিবেদিতা হাজরা

মালদহের গাজোল থেকে বারো কি.মি দূরের গ্রাম কদমতলি। সেদিন ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি। ফুরিয়ে আসা শীতের দুপুরের শেষ লগ্নকে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েগুলো প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগল। বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে ওরা তখন বাঁশবাগানে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, এমনকি সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। পাঁচ থেকে সাত বছরের চারটে ছেলেমেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। বেশ কয়েক ঘন্টা জঙ্গলের ফলমূল ছাড়া ওদের পেটে কিছুই পড়েনি। বাঁশবাগান থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরলে ওদের নিয়ে সকলে গবেষণায় বসল। নিশ্চিত ভূতে ধরেছে। অন্য কিছু কেন হবে? বাঁশবাগানে নিশ্চই খারাপ হাওয়া গায়ে লেগেছে! দু-একজন স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে বললেও অধিকাংশই একমত হয়ে ওঝা ডাকল।

ভূত ধরা কেসে ওঝার কাছেই যেতে হয়! ওঝা-গুনিন নানা তন্ত্র-মন্ত্র জানেন! তা ছাড়া ওদের ডাকলে অবশ্যই হাজির হয়। খরচ-খরচাও মানুষের সাধ্যের মধ্যে! তাই কয়েকজন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে বললেও বেশিরভাগই ওঝা ডাকায় মত দিল। কেন দেবে না? ওঝা ডাকলে তাকে নিশ্চিত পাওয়া যায় কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সারাবছর ডাক্তার থাকার গ্যারান্টি আছে কি? না নেই। ওঝা-গুনিন মন্ত্র-তন্ত্র বলে চেষ্টা করবেন, পেট থেকে ঝেড়ে বিষ নামানোর চেষ্টা চলবে। বলছিল তাই কিন্তু কাজ হচ্ছিল না।

এরমধ্যে কেউ বা কারা থানায় খবর দেওয়ায় পুলিশ এল। পুলিশ দুই ওঝাকে পাকড়াও করল। জেরার মুখে এর চিকিৎসা কী তা ওদেরও জানা ছিল না বলে ওঝারা শিকার করল। ওঝা ব্যর্থ হওয়ায় সকলে ওদের মালদহের সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ছয় বছরের শিশু, দিনমজুর আব্দুল আবিরের শিশুপুত্র ফিরোজ হাসপাতালে ঢোকার আগেই মারা যায়। পাঁচ বছরের অপর শিশু সফিকুল ইসলাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। চিকিৎসা পেয়ে কোহিনূর খাতুন আর তার বোন সবনুর বেঁচে যায়। মৃত ফিরোজের দিনমজুর বাবা ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে জানান – 'এমন হবে ভাবতেও পারিনি'।

এই ঘটনার পর এই খবর সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি এমএলএ, গায়ের মোড়ল, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ সকলেই কুসংস্কারাচ্ছন্নতার জন্য শিশুদের গার্জিয়ানদের দায়ী করেছে। ওদিকে ঘটনার গভীরে গেলে প্রশাসনের চরম গাফিলতি নজরে আসে। প্রথমতঃ শিশু দুটির দেহ ময়নাতদন্ত না করে গোর দিয়ে দিয়েছে অথচ হাসপাতালের সুপার সাংবাদিকদের বলেছেন শিশুরা বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেলায় বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। তাহলে ময়নাদতদন্ত হওয়ার আগে ডেডবডি হাসপাতালের বাইরে গেল কিভাবে ? দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসীরা শিশুগুলিকে প্রথমেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনার কথা ভাবেননি ওঝার কথা ভেবেছেন। পরে ওঝারা ব্যর্থ হওয়ায় সদর হাসপাতালে গেছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নয়। এর কারণ কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ? নাকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স, স্যালাইন, মেশিনপত্র, ওষুধ পাওয়ার নিশ্চয়তা নাই ওঝার আসার নিশ্চয়তা তার চেয়ে বেশি! এরপরও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ বলেছে ওঝা এবং গ্রামবাসীদের কাউন্সেলিং করা দরকার!

সত্যি কথা বলতে কি ফিরোজ অথবা সফিকুল বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। ওদের মৃত্যুর জন্য শহুরে শিক্ষিত সমাজ গ্রামবাসীর অজ্ঞতা আর কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকেই দায়ী করেছে। ফিরোজ, সফিকুলের প্রতিবেশীরা প্রকৃত পক্ষে কি নির্দোষ ? না, ওদের সব থেকে বড় দোষ হল এই যে ওরা খুব গরীব। না হলে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা মেলে না জেনে ওরা প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে, ওষুধের দোকানে গেল না কেন ? গরীব বলে ওদের এসব মাথায় আসে নি। আর যদি ওরা গরীব না হত তবে ওরা ওঝার ভরসায় বসে না থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সব সাধন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করত নাকি! এরপরও ফিরোজ, সফিকুলের প্রতিবেশীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে গাল পেড়ে নিজেদের কর্তব্য শেষ করে হাত ধুয়ে ফেলা যায় না। বিজ্ঞান আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপদান করার কঠিন কর্তব্যে সামিল হতে হয়।■

●লক ডাউন চলাকালীন সকল নাগরিককে খাদ্য এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিনা মূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

●চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্য কর্মী, সাফাই কর্মী এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কর্মে লিপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের সংক্রমণ মোকাবিলার জরুরী সামগ্রী অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে।

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

(ষষ্ঠ পর্ব)

– হরিরাম আহমেদ

‘গণিত বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পাটিগণিতের জটিল চিন্তন পদ্ধতিকে সহজতর করার জন্য গণিতের ক্রমবিকাশ প্রয়োজন ছিল। আমরা আগের পর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে প্রাচীন ভারতে সমান্তর প্রগতি, গুণোত্তর প্রগতি – এসবের ধারণা ছিল। কোনো একটি সংখ্যার বর্গমূল, ঘনমূল নির্ণয় করতে জানতেন ভারতীয় গণিতবিদরা। এর প্রমাণ মেলে ৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে আর্যভট্টের লিখিত ‘আর্যভট্টীয়’ গ্রন্থে।

একদিকে আমরা যেমন স্থানাঙ্ক জ্যামিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যেখানে অন্তত দুটি পরিবর্তনশীল চলরাশি পাই, তেমনই বীজগাণিতিক সমীকরণের ধারণা কিন্তু ইউরোপের অনেক আগে ভারতে দেখা গেছে। ব্রহ্মগুপ্ত ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের সুস্পষ্ট ধারণা দিলেন। পরবর্তীকালে একেই শ্রীধর আচার্য একাদশ শতকে বিখ্যাত সমাধান দেন।

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

এটি ax2 + bx+c = o এই দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান। যেখানে x হল একটি চলরাশি (variable) এবং a, b, c স্থির। লক্ষণীয় যে এখানে x এর দুটি মানের একটি ঋণাত্মকও হতে পারে।

ব্রহ্মগুপ্ত ax + by = c x, y দুটি চলরাশি এবং a, b, c হল স্থির পূর্ণসংখ্যা

– এই সমীকরণের সমাধান দেন বীজগাণিতিক উপায়ে। এছাড়া ভারতীয় গণিতবিজ্ঞানী ভাস্কারাচার্যের ‘চক্রবাল পদ্ধতি’ চিরস্মরণীয়। ভারতীয় গণিতবিদদের এই আবিষ্কার বহুকাল পর্যন্ত ইউরোপের অজানা ছিল। সামন্ততান্ত্রিক আঞ্চলিক উৎপাদন পদ্ধতির মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানও স্থানীয় – আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রমের চেষ্টা করেনি। আল খোয়ারিজমির হাত ধরে পরোক্ষ উপায়ে ভাস্করাচার্যের ‘চক্রবাল পদ্ধতি’ ইউরোপ স্বতন্ত্রভাবে পেয়েছে ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে গণিতজ্ঞ লিওনার্দো অয়লারের হাত ধরে। তখনও তাঁরা জানতেনও না যে এই

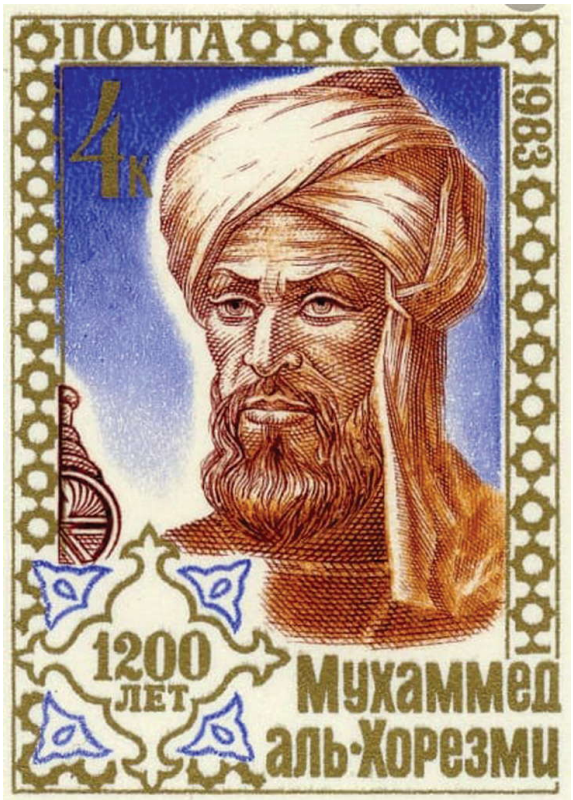

আল খোয়ারিজমি-এর ছবি সোভিয়েত ডাক টিকিটে

সমস্যার সমাধান পাঁচশো বছর আগেই ভারতে হয়ে গেছে। আজকাল একটা প্রচার চলছে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতে বৈদিক যুগ যা কিছু দিয়েছে, তা পরবর্তীকালে বাকি পৃথিবী জেনেছে। সেই প্রসঙ্গ ধরে এই পরিসীমার মধ্যে এটাই বলা যায়, ভারতের গণিত বিজ্ঞানের যে নমুনাগুলি তুলে ধরেছি, সবই বৈদিক যুগ পরবর্তী ভারতের।

আল খোয়ারিজমির দ্বিতীয় বইটার নাম ‘আল-জাবর’ আল মুকাবালাহ (Al-Jabrw’ al Muqabalah)। এই বই-এর নামকরণ থেকেই অ্যালজেবরা (Algebra) কথার উৎপত্তি। **অনেকের ধারণা এই যে অ্যালজেবরা বা বীজগণিতের জন্ম আল-খোয়ারিজমির হাত ধরে। প্রকৃত ইতিহাস আমরা দেখিয়েছি যে এর জন্মসূত্র ভারতে। এর আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ**

ক্রমান্বয়ে হয়নি। ফলে সারা বিশ্বের মানুষের বীজগণিতের জ্ঞান লাভ হতে দ্বাদশ শতাব্দী লেগে গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে লাটিন ভাষায় আল খোয়ারিজমির অ্যালজেবরার অনুবাদ হয়। আরও বীজগাণিতিক সমাধান, আবিষ্কার যা ভারতে হয়েছিল সেগুলো ইউরোপ বহুকাল জানতেই পারেনি।

বীজগণিত মানুষকে তার চারপাশের বাস্তবিক ঘটনাকে গাণিতিক পরিভাষায় প্রকাশ করাতে শেখালো। এইভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা দুই বা ততোধিক চলরাশি বা ভেরিয়েবল পেলাম। সেগুলোর একের মান পরিবর্তীত হলে অন্যরাও পাল্টায়। এমন করে বীজগণিতের ভাষাও যুক্তির বিচারে আমরা পেয়েছি। তাই পাটিগণিত ও বীজগণিত একই ঘটনাকে দুইরকম ভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে পেরেছি। যেখানে উভয় প্রক্রিয়ায় সমাধান প্রায় একই হবে। **বীজগণিত আসায় পাটিগণিতের যুক্তিপূর্ণ জটিলতর ভাষা সমীকরণের দ্বারা সহজবোধ্য হল।**

কত দার্শনিকদের পাতার পর পাতা যুক্তি তর্কের দ্বারা মানুষকে বোঝাতে সময় লেগেছে অলৌকিকতাবাদের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে। অথচ আমাদেরই দেশের সেই বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ অক্ষয় কুমার দত্তের সেই সমীকরণটি মনে করুন।

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

অতএব প্রার্থনা = শূন্য

বীজগণিতের ভাষা শুধু সহজবোধ্য নয়, তা বাস্তব ভূমি থেকে সৃষ্টি হয়ে সকল বাস্তবতা থেকে ছেঁকে বেড়িয়ে এসে নির্মেধ কতগুলি চলরাশির পারস্পরিক সম্পর্কে পরিণত হল। এই বিষয়টি আমাদের কথ্য ভাষায় হয়তো দুর্বোধ্য লাগছে। কিন্তু এর থেকে সহজভাবে বুঝে নেওয়া যায় বীজগাণিতিক কোনো সমীকরণ, শুধু একটা নতুন অভ্যাসের প্রয়োজন। আমরা বয়েলের সূত্র থেকে পেয়েছিলাম $P = KV$। এখানে P এবং V দুটি চলরাশি। K একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। যদি ধরা যায় K এর মান 4, তবে $P = 4V$, আবার আমাদের দাদুর বয়স, তাঁর নাতনির বয়সের চারগুণ হলেও এভাবে লেখা যায় $P = 4V$, যেখানে V = দাদুর বয়স, P = নাতনির বয়স। এরকম বাস্তব জগতের সমধর্মী যাবতীয় সম্পর্কই $P = 4V$ দিয়ে প্রকাশ করা চলে। বীজগাণিতিক সমীকরণ যা গ্যাসের চাপ-আয়তন, মানুষের বয়সের মধ্যকার সম্পর্ক বা আরো অসংখ্য বাস্তবিক উদাহরণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। **এই কারণেই বলছি বীজগণিত বাস্তব জমি থেকে সৃষ্টি হয়েও তা সকল বাস্তবতাকে ত্যাগ করল। গণিত এবারে কাল্পনিক বা অ্যাবস্ট্রাক্ট (বিমূর্ত) হয়ে গেল।**

গণিতের বিমূর্তিকরণ কিন্তু হয়েছে মানব মনের অবিরত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ক্রম পরিবর্তনশীল সম্পর্কের কারণে হয়েছিল। প্রকৃতিকে মানুষ যত গভীরতর, জটিলতর রূপে জানতে থাকলো, ততো সে খুঁজতে শুরু করলো জ্ঞান আহরণের ও তার ক্রমবিকাশের জন্য সহজসাধ্য পদ্ধতি। গণিত সেই ভূমিকা নিয়েছিল আগেই। এখন তা অপরিহার্য হয়ে পড়ল।

আল খোয়ারিজমির হাত ধরে আরব যেভাবে বীজগণিত শিখেছিল, তার অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা নমুনা তুলে ধরছি ঃ–

আল খোয়ারিজমির যে বীজগণিত সম্মন্ধিয় বইটির থেকে উদাহরণ দেব, তার নামকরণ 'আল জবর' আল মুকাবলাহ্'। এখানে আল জবর (Al-jabr) অথার অর্থ সমতা রক্ষা করা। কাদের মধ্যে সমতার কথা বলা হচ্ছে ? বীজগণিতে সমীকরণের বামপক্ষের সঙ্গে ডানপক্ষের সমতার কথা বলা হচ্ছে। এই বামপক্ষ যেমন অসংখ্য বাস্তবিক সমস্যার বিমূর্তরূপ, তেমনি ডানপক্ষ ঐ বামপক্ষের উপর কোনো ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত রূপ। সেই ক্রিয়াকে গাণিতিক ভাষাতেই লিখতে হচ্ছে। এখন বাম ও ডানপক্ষ আপাত দৃষ্টিতে অসম লাগলেও তারা আসলে সমান। এমন পরিস্থিতিতে এই সমতাকে বজায় রাখার জন্য যে কাজ করলেন তিনি, তাকে বলে 'আল জবর' অর্থাৎ restoration of balance (সমতা রক্ষা করা)।

আবার এই ক্রিয়ার ফলেই উভয় পক্ষের বিরোধ তৈরি হল। যাকে তিনি 'আল মুকাবলাহ' বা oppositon বলেছেন। আজকে আধুনিক সাংকেতিক অ্যালজেবরা থেকে ব্যাখ্যা করছি ধরি $6x = 5x + 11$

বা $6x + (-5x) = 5x + 11 + (-5x)$

[এটা 'আল জাবর' বা restoration of balance]

বা, $x = 11$

[এটা আল মুকাবলাহ বা Simplifying the result by canceling opposite terms]

বাস্তব জগতে যেমন যেকোনো ক্রিয়ারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়, গণিতেও তাই হল। **এখান থেকেও বলা যায় গণিত অবাস্তব নয়, বাস্তবের সামগ্রিক নির্যাস।**

আল খোয়ারিজমি যেহেতু ইউরোপীয় দার্শনিকদের থেকে কম প্রভাবিত ছিলেন, তাই তাঁর বইটি সামগ্রিকভাষায় পাটিগণিতের মতো কথ্য ভাষায় রচিত।

উদারহণ দেখা যাক ।

বঙ্গানুবাদ	ল্যাটিন সংস্করণের ইংরাজী অনুবাদ	আধুনিক বীজগণিতের ভাষায়
নিম্নের উদাহরণটি একটি বর্গের ও তার বর্গমূলের, যা একটি সংখ্যার সমান : একটি বর্গ এবং তার বর্গমূলের দশগুণ 39 এককের সমান	The following is an example of squares and roots equal to numbers : a square and 10 roots are equal to 39 units	x2+10x = 39
এই ধরনের সমীকরণ থেকে যে প্রশ্নগুলো বের হয়ে আসে সেগুলি ঃ – কি সেই সংখ্যাটি যার বর্গের সাথে তার বর্গমূলের দশগুণ যুক্ত হয়ে 39 এর সমান হয় ?	The question therefore in this type of equation is about as follows : What is the square which combined with ten of its roots will give a sum total of 39?	Solve for x^2
পদ্ধতিটি হল সংখ্যাটির বর্গমূলের সাথে গুণ করা হয়েছে যে সংখ্যাটি, তার অর্ধেক নির্ণয় করা। এখন বর্গমূলটির আগে থাকা সংখ্যাটি এখানে 10। তাই এর অর্ধেক অর্থাৎ 5 নিতে হবে, যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 25, যা 39 এর সাথে যোগ করলে 64 পাওয়া যায়*	The manner of soliving this type of equation is to take one-half of the roots just mentioned now the roots in the pvoblem before us are 10 .Therefore take 5, which multiplied by it self gives 25, an amount which you add to 39 giving 64*	$^1/_2$. 10=5 5^2=25 x^2+10x+25 = 39+25 বা, x^2+10x+25 = 64
এর বর্গমূল বার করতে হবে যা কিনা 8	Having taken then the square root of this which is 8,	বা, $(x+5)^2 = 8^2$ বা, x+5 =8
এর থেকে ঐ বর্গমূলের সাথে গুণকরা সংখ্যার অর্ধেক, অর্থাৎ 5 বিয়োগ করতে হবে। পরে থাকে 3	Subtract from it the half of the roots 5, leaving 3	বা, x+5 = –5 = 8–5 বা, x = 3
এই সংখ্যা তিনটি তার ফলে ঐ বর্গের **একটি বর্গমূলকে** বোঝায় যা কিনা অবশ্যই 9। তাই হল সেই বর্গ সংখ্যাটি।	The number three therefore represents one root of this square, which itself of course, is 9. Nine therefore gives that square	x^2 =9

লক্ষণীয় যে পুরো বীজগাণিতিক সমাধানটিকে পাচ্ছি পাটিগণিতের মনন থেকে উত্তরণের পর্যায়ের। তাই পূর্বের রেশ থেকে যাচ্ছে এবং তিনি আধুনিক বীজগণিতের মত ঋণাত্মক সংখ্যা কল্পনাই করতে পারেন নি, যা পাটিগণিতে নেই।

আজকে আমরা অনেক জটিলতা থেকে মুক্ত। তাই সমাধানটি করবো নীচের মতো করে –

$$x^2 + 10x = 39$$

*** এখানে ঐ 'আল জাবর' বা সমীকরণের সমতা বিধান করার চেষ্টা হল।**

বা, $x^2+2.(5).x+(5)^2=39+(5)^2$

বা, $(x+5)^2=64$

বা, $(x+5)^2=\pm\sqrt{64}=\pm8$

সুতরাং $x=+8-5=3$

অথবা $x=-8-5=-13$

আল খোয়ারিজমি আগের সমাধানটিকে জ্যামিতির সাহায্যে করে দেখালেন। ধরা যাক একটি বর্গক্ষেত্র যার একক একটা বাহুর দৈর্ঘ্য x এবং একটি আয়তক্ষেত্র যার একটি বাহু 10 একক এবং অন্যটি x তাদের যোগফল যদি 39 হয় তবে একে জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে কীরকম পাচ্ছি ?

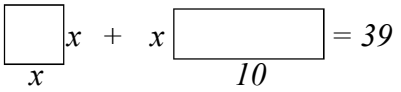

এবার আয়তক্ষেত্রটিকে সমান চার টুকরো করা হল এমনভাবে যাতে এক একটা টুকরোর একটি বাহু x থাকে, তবে উপরের ছবিটা দাঁড়ায়

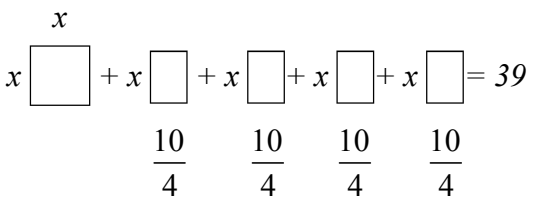

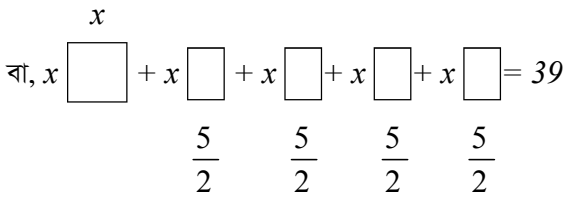

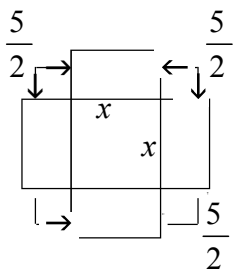

বা, $= 39+4.(5/2)^2$

$=39+4.(\frac{5}{2})^2$

বা, $\left(x+\frac{5}{2}\times2\right)^2=64$

বা, $(x+5)^2=64$

বা, $(x+5)=\sqrt{64}$

$=8$

(যেহেতু তিনি ঋণাত্মক ধারণা করতে পারছেন না, জ্যামিতির এই উদাহরণে সম্ভব নয়।)

বা, $x=8-5=3$

তার ফলে ক্ষুদ্র বর্গ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল $3^2=9$

আমরা এই পর্বের আলোচনা যেহেতু 'গণিত' বিষয়ের মধ্যে থাকছি, তাই আরবের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে আরো যে সমস্ত মহান মনিষীদের অবদান আছে (যেমন আল বিরুনি) তাঁদের অবদান আলোচনায় আনছি না। এই সময়কালে ভারতের 'গণিত' বিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষ কারোর নাম পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্তের বীজগণিত ছাড়া বিশেষ কিছু ভারত পায়নি।

ইউরোপ দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে আরবের কাছ থেকে বীজগণিত শিখতে শুরু করে। এত দিনকার ইউরোপের (বিশেষ করে গ্রিসের) গণিত ছিল মূলত জ্যামিতির উপর ভিত্তি করে। আবার তাদের আবিষ্কৃত জ্ঞানভান্ডার এমনও ছিল যা অনেক আগে অন্যত্র আবিষ্কার হয়ে গেছিল। উদাহরণ স্বরূপ দার্শনিক ইউক্লিড তাঁর গ্রন্থে পিথাগোরাসের নামে যে উপপাদ্যটির নামকরণ করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে তা ভারতের বৌধায়নের শুল্বসূত্রে অনেক আগেই উল্লিখিত রয়েছে। অনেকের মতে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরের পিরামিড নির্মাণে এই জ্ঞানের

প্রয়োজন ছিল। এমন কথা ভারতে আবিষ্কৃত 'চক্রবাল' পদ্ধতি সম্পর্কেও বলা চলে। এগুলো কেন হয়েছে? একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় কোথায় যেন ছেদ নজরে আসছে বলে মনে হয়। ব্যাপারটাকে একটু গভীরে যাওয়া দরকার। কোনো দেশের বা সংলগ্ন অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে একটা ধারাবাহিক গতি আমরা খুঁজে পাবো। কিন্তু সব সময় ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে এই যোগসূত্র পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এগুলিকে সেই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থার সাথে মিলিয়ে না দেখলে হবে না। আমরা উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছি যে ইসলাম পূর্ববর্তী আরব এবং ইসলামিক আরবে জ্ঞানের চর্চায় যুগান্তকারী পরিবর্তনকে। মনে রাখতে হবে মহম্মদ প্রায় পুরো ইউরোপ সহ বিস্তীর্ণভূখন্ড জয় করে নিয়ে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করছেন তখন। তার রেশ থেকে গেছে পরবর্তী খলিফাদের শাসনকালেও। কিন্তু ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তি এই সময় দেখা গেলে সেখানে সামন্তযুগ ও তার শেষ পর্যায়ে এমনকী পুঁজিবাদের প্রারম্ভে ইউরোপ জেগে উঠেছিল। গণিতেও অগ্রগতি সে সময় হয়েছে স্মরণীয়ভাবে।

আমরা এর আগের অধ্যায়গুলিতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তাঁরা প্রায় সকলেই ইউরোপিয়ান। কিন্তু সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের দার্শনিকদের অবদান অনেকাংশে উপেক্ষিত। এর পাশে এটাও বলা দরকার যে সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মে সমাজের যে ক্রমবিকাশ, তা নমুনা হিসাবে আমরা ইউরোপেই সর্বপ্রথম দেখতে পাই। তাই সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মানুষ বেশি বেশি করে পাবো, এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

বিজ্ঞানী মার্কসের যে নোটের থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম সেখান থেকে জানা যায় প্রাচীন ইউরোপ গ্রিকদের কাছ থেকে শিখেছিল পাটিগণিতের চারটি পরিকর্ম, জ্যামিতি অনুপাত ও সমানুপাতের বৈশিষ্ট্য, সমান্তর ও গুণোত্তর প্রগতি, অমূলদ রাশির প্রসঙ্গ এবং বর্গমূল ও ঘনমূল। গ্রিক দার্শনিক হিপার্কাস কতৃক ত্রিভূজের সাইন ও কোসাইন সারণি। অবাক করা ব্যাপার এই যে সমান্তর ও গুণোত্তর প্রগতি, বর্গমূল, ভারতেও স্বতন্ত্ররূপে প্রাচীন বৈদিক ও বৈদিক পরবর্তীযুগে চর্চিত হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে স্বতন্ত্রভাবে বরাহমিহিরের লেখায় সাইন ও কোসাইন সারণী (অন্য পরিভাষায়) পাওয়া যায়।**পরিষ্কার বোঝা যায় গণিতের এই বিকাশ ভৌগলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলিতে আন্তসম্পর্কহীন ভাবে হয়েছে কখনো কখনো। আবার কখনো তাদের জ্ঞানের আদান-প্রদানও হয়েছে। কিন্তু এই আদান-প্রদানের কারণ স্বতঃস্ফূর্ত নয় কখনোই, এর কারণ রাজনৈতিক। একমাত্র পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন এক অর্থনীতি, যার কোনো দেশীয় গন্ডি নেই। পুঁজিবাদ রাজনৈতিক অর্থে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দিয়ে ভূখন্ডগুলিকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা দিলেও অভ্যন্তরে পুঁজিবাদ অর্থনৈতিকভাবে প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক। তাই ইউরোপে পুঁজিবাদের আগমনের পর থেকে গণিতের সব শাখায় একে একে সমাপতন হতে থাকলো। পারস্পরিক সম্পর্ক হল নিবিড়।**

ইউরোপে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত সামন্ততন্ত্র ছিল (সর্বত্র একভাবে না হলেও মোটের উপর)। ১৪ শতকে ইউরোপে প্লেগের মড়কে যেমন এর এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা কমে গেছিল তেমনি ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয়। এটা ছিল গ্রিকদের শেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এইসময় বহু পশ্চিমীপন্ডিত ইউরোপের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েন। এরা সাথে করে নিয়ে গেছিলেন গ্রিক দর্শন ও ম্যানুস্ক্রিপ্ট। এই সময়কালে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মান ব্ল্যাকস্মিথ গুটেনবার্গ ছাপার যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এরফলে প্রাচীন বিজ্ঞান চর্চার নিদর্শনের অসংখ্য কপি, অনুবাদ ও নতুন পুস্তকের অনেক কপি বহুজনের হাতের নাগালে এসে যায়। অ্যাপোলোনিয়াসের এবং আল খোয়ারিজমির লেখা পুস্তক (বিশেষ করে বীজগণিত) চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। এই সময়কালে ইউরোপে দর্শনের জগতে কী কী হয়েছে তা বিগত পর্বে উল্লেখ করে গেছি।

আগামী পর্বে গণিতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কীরকম গুণগত ও পরিমাণগত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল তা তুলে ধরবো।

(ক্রমশ)

চিকিৎসক স্বাস্থ্য কর্মী সহ জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকলের পাশে দাঁড়ান।

চয়ন ঃ

গোমূত্র এবং গোবর কি সর্বরোগহরা ?

[সমীক্ষণ, জুন ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাটির অংশবিশেষ পুনঃপ্রকাশিত হল।]

গোমাতার মাহাত্ম!

এখন প্রশ্ন হল গরুর বর্জ্য পদার্থ সর্বরোগহরা, পবিত্রতার প্রতীক এবং ঈশ্বরের প্রসাদতুল্য এবং পরিবেশবান্ধব বলে এত প্রচার হচ্ছে কেন? কেন্দ্র সরকার তার সকল সরকারি দপ্তরে এবং রাজস্থান সরকার সকল সরকারি হাসপাতালে এর ব্যবহার চালু করছে কেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে যাওয়ার আগে গোমাতার মাহাত্ম নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারের দিকে চোখ বোলানো যাক।

হিন্দুত্ববাদীরা বহুকাল ধরেই বলে আসছে গরু হল সমগ্র মানব সমাজের মাতা তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাতা, ঈশ্বস্বরূপিনী। তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করা উচিত। গরুর শরীর থেকে ক্ষরিত এবং রেচন পদার্থ হিসাবে নিষ্কাশিত পদার্থগুলিকে বলা হয় 'পঞ্চগব্য'। এই পঞ্চগব্য হল গরুর মল বা গোবর, গোমূত্র, দুধ, ঘি এবং দই। বলা হচ্ছে যে গোমূত্র (গৌমূত্র আসভ বা জারিত গোমূত্র), গৌ-অর্ক (পরিশোধিত গোমূত্র) এবং গনাবতী (গোমূত্র থেকে প্রস্তুত ট্যাবেলট) হল ওষধি যার দ্বারা নাকি সাধারণ জ্বর থেকে ক্যানসারের মত শতাধিক রোগের নিরাময় সম্ভব। পঞ্চগব্য নাকি মানুষের শরীর ও মনকে শুদ্ধ করে। কোন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে পঞ্চগব্য ব্যবহার হল আবশ্যিক। গোবর্জ্য শুধু মানুষের উপকারে আসে তা নয়, তাকে কীটনাশক এবং সার হিসেবে চাষের জমিতে ব্যবহার করা যায়। অতি সম্প্রতি পঞ্চগব্যকে চিকুনগুনিয়া অসুখেরও ওষধি হিসাবে দাবি করা হচ্ছে। শুধু 'গোনাইল' নয়, গোমূত্র থেকে মাথায় মাখার তেল, শ্যাম্পু, ত্বকের ক্রিম প্রস্তুত করা হয়। সাবান, নাসিকায় ব্যবহার্য পাউডার, বডি পাউডার, বডি ক্রিম, ধূপকাঠি, দাঁতের মাজন প্রভৃতি তৈরি হয় গোবর থেকে। দাবি করা হয়েছে অসংকর (পিওর ব্রিড কাউ) গরুর বর্জ্য পদার্থের নাকি ৯০ থেকে ৯৮ শতাংশ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। আর সংকর গরুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ৪০ শতাংশেরও কম।

এই দাবিগুলির ভিত্তি কি? এর প্রধান ভিত্তি হিসাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত 'চরক সংহিতা', তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত 'শুশ্রুত' এবং ৭ম শতাব্দীতে রচিত 'ভাগবৎ'-এ উল্লিখিত কিছু শ্লোককে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। চরক সংহিতায় গরুর রেচন পদার্থের মাহাত্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঃ

১) গরু আমাদের মাতা এবং আমরা তাঁর সন্তান। সুতরাং গোমূত্র আমাদের পক্ষে উপকারী।

২) শরীরে কোনো অসুখের কারণ হল পিত্তরস, শ্লেষ্মা এবং বায়ুতে কিছু মৌলের ভারসাম্যের অভাবে। গোমূত্র সেই মৌলগুলির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে।

৩) জীবজগতের সকলের মূত্রের মধ্যে গোমূত্রই শ্রেষ্ঠ।

৪) গোমূত্রের মধ্যে স্বয়ং মা গঙ্গা অবস্থান করেন এবং গোমূত্রে তামা এবং সোনার লবণ আছে। গোমূত্র এমন পদার্থ যা যেকোনো ধাতুর সংস্পর্শে এসে তাকে সোনায় পরিণত করার ক্ষমতা রাখে। গোমূত্রের ক্ষয় হয় না, তার গুণাগুণ নষ্ট হয় না। গোমূত্র যত পুরানো হয় ততই তা ব্যবহারের উপযোগী হয়।

'শুশ্রুত' এবং 'ভাগবৎ' কাব্যে বলা আছে গোমূত্র এবং গোবরে কোনো বিষাক্ত পদার্থ নেই। এর ব্যবহারে সব অসুখ নির্মূল হয়। এর কারণে হিন্দুত্ববাদীরা প্রচার করে জগতের মাতাগরু অবশ্য পূজনীয়। একে হত্যা করা বা গোমাংস ভক্ষণ অপরাধ। এই অপরাধ করলে নরকযাত্রা নিশ্চিত। শুধু তাই নয় গোহত্যাকারী বা গোমাংস ভক্ষণকারী শুদ্রশ্রেণীর মানুষ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমানদের হত্যা করা অপরাধ নয় পূণ্যকর্ম। ইহজগতে কোনো পাপ কাজ করলে পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান আছে সেই প্রায়শ্চিত্ত করার সময় গোবর ও গোমূত্র সেবন অপরিহার্য। অন্য ধর্ম থেকে হিন্দু হতেও যে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান আছে তাতেও গোবর ও গোমূত্র সেবন আবশ্যিক।

গো মাহাত্ম প্রচারে ছদ্মবিজ্ঞানের প্রয়োগ

একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষকে শুধু এইসব পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণায় সন্তুষ্ট করা যায় না। তাই ওইসব পৌরাণিক কাহিনীর যথার্থতা প্রমাণে 'তথাকথিত বিজ্ঞানীদের' বাজারে নামানো হয়েছে। এই প্রচার

হিন্দুত্ববাদী বিজেপি'র কেন্দ্র বা রাজস্থান রাজ্য সরকার এবছরই প্রথম করল এমন নয়। মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীর মত কট্টর হিন্দুত্ববাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, নানা সাধু সন্ড় এবং পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হওয়া তথাকথিত খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, নানা এনজিও এই প্রচার করছে দীর্ঘ্যকাল যাবত। ২০০৪ সালেই কেন্দ্র সরকার গোমূত্রের বিশুদ্ধতা নিয়ে ছদ্ম গবেষণা শুরু করেছিল। নানা বিরোধিতায় সেই সময় সেই গবেষণা বন্ধ হলেও সেই সময়কার তথাকথিত গবেষকদের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলিকে হাতিয়ার করছে হিন্দুত্ববাদীরা। এইসব গবেষকদের রচিত গবেষণাপত্রগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল – অ্যানালাইসিস অফ কাউস ইউরিন ফর ডিটেকশন অফ লাইপেস অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল প্রপার্টিস – সানিশ কুমার; পঞ্চগব্য (কাউপ্যাথি) কে. ধামা, আর রাঠোর, আর এস চৌহান, এস তোমার; ম্যাজিক্যাল থেরাপি–কাউ ইউরিন – এইচ ভাদুরি; পঞ্চগব্য থেরাপি – আর এস চৌহান ইত্যাদি।

এই সকল গবেষণাপত্রগুলিই হল বস্তুবাদী দর্শন বিরোধী, ভিত্তিহীন, মনোগত, চাতুরিপূর্ণ এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রচিত। যা বৈজ্ঞানিক মহল কখনই মান্যতা দেয় না।

বিজ্ঞান কী বলে?

গরু হল একপ্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী – মহিষ, ঘোড়া, ইঁদুর, বাঁদর, হাতি, বাঘ, ছাগল, ভেড়া, মানুষের মত। এই সকল প্রাণীদের মূত্র (ইউরিন) হল তাদের শরীরের কিডনি (বৃক্ক) দ্বারা পরিশ্রুত একধরণের তরল বর্জ্য পদার্থ এবং তার রেচন হয় ইউরিনারি সিস্টেম বা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই মূত্রে থাকে নানা দ্রবীভূত যৌগ, জৈবনিক (বায়োলজিক্যাল) পদার্থ বা জীবিত শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় বলেই তা শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয় মূত্রনালী দ্বারা। মূত্রে শরীরের অপ্রয়োজনীয় রেচন পদার্থগুলিতে এমন অনেক পদার্থ থাকে যা ওই রেচন পদার্থগুলির নিষ্কাশনে বড় ভূমিকা নেয়। রাসায়নিক উপাদান হিসেবে মানুষের মূত্রের সাথে অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মূত্রের বিশেষ কোনো ফারাক থাকে না, খাদ্যাভ্যাসের কারণে উপাদানগুলির অনুপাতের হারের কিছু ফারাক ছাড়া।

বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু ব্রিসটো, ডেভিড হোয়াটহেড, জন ই ককবার্ন তাঁদের প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে (জার্নাল অফ সায়েন্স ফর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার) ১০টি গরু, ৫টি ভেড়া এবং ৪টি ছাগলের মূত্রের নমুনা নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এইসব মূত্রগুলিতে থাকা রাসায়নিকগুলির মূল উপাদান হল – জল এবং নানা নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ, কিছু এনজাইম এবং অন্যান্য জীবাণু। এই নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগগুলি হল ইউরিয়া, অলানটয়েন, হিপপিউরিক অ্যাসিড, ক্রিয়েটিনিন, ক্রিয়েটিন, ইউরিক অ্যাসিড, জ্যানথাইন, হাইপোজ্যানথাইন, মুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া। গরু-ছাগল ও ভেড়ার মূত্রে এই উপাদানগুলির হার অল্পবিস্তর ভিন্ন। মানুষ এবং গরুর মূত্রে ইউরোকাইনেস বলে একপ্রকার এনজাইম পাওয়া যায় যা মূত্রকে জমাট বাধতে বাধা দেয়। মানুষের মূত্র থেকে এই এনজাইম পৃথক করে তাকে ধমনীতে রক্ত জমাট বাধা রুখতে ব্যবহার করা হয়। তাই বলে প্রত্যেক মানুষ যদি স্বমূত্র পান করেন তবে তার ধমনীতে রক্ত জমাট বাধা রোধ হয় না। বিজ্ঞানীরা তাই হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচতে স্বমূত্র পান করার পরামর্শ দেন না। কারণ এতে হিতে বিপরীত হয়। মানুষ, গরু প্রভৃতি প্রত্যেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্রে যে সব বিষাক্ত (টক্সিক) যৌগগুলি থাকে তা শরীরে ভয়ানক ক্ষতি করে। নিয়মিত পান করলে মৃত্যুও হতে পারে। গরু সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্র সংক্রামক অসুখ লেপটোস্পাইরোসিস-এর কারণ। এই অসুখ মুখের ভিতরের মাংস ও চামড়ায় ক্ষয় ঘটায়, ছড়িয়ে পরে। **গরুর মল বা গোবর অ্যান্টিসেপটিক – এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন শুধু নয় মারাত্মকভাবে আমাদের ভুলপথে পরিচালনা করে।** মলত্যাগের সময় গরু বা অন্য যে কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া নির্গত হয়। সুতরাং গোবর কোনো ঘায়ে লাগালে ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

নাইজিরিয়ায় গোমূত্রকে বিষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেদেশে ১৯৭৫ সালে এক পরীক্ষাগারে ইঁদুরের উপর গোমূত্র নিয়মিত প্রয়োগ করে তার বিষক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে ধারাবাহিক প্রয়োগের ফলে ওই ইঁদুরগুলি মারা গেছে। ওই দেশে ১৯৭৭ সালে কুকুরের উপর প্রয়োগ করেও দেখা গেছে যে কুকুরগুলিকে নিয়মিত গোমূত্র সেবন করানোর ফলে তারা কার্ডিওরেসপিরেটরি সমস্যায় (শ্বাস কষ্টে) মারা যায়। রয়াল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণাপত্রে এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে।■

সংগঠন সংবাদ ঃ

নাগরিকত্বের নামে জনতাকে উৎপীড়ন ও বিভাজনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্ক

নাগরিকত্বের নামে জনতাকে উৎপীড়ন এবং ধর্ম-ভাষা-জাতির ভিত্তিতে বিভাজনের বিরুদ্ধে সংগঠন তার সাংগঠনিক শক্তি অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার কর্মসূচী রেখেছে এবং আতঙ্কগ্রস্থ মানুষের পাশে থেকেছে। বিগত সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে চর্চা করে এই প্রশ্নে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে এবং তার প্রচার জারি রাখা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ এর শুরুতেই গণতান্ত্রিক এবং ছাত্রসংগঠনের সাথে যৌথ প্রচারপত্রে বলা হয়েছে **"বিদেশী অনুপ্রবেশকারী তাড়ানোর অভিযান কি বিজ্ঞানসম্মত?** এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হল – না। আদিম মানুষ ৪০ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। আধুনিক মানুষ (হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স) ৬৫ হাজার বছর আগে ঐ আফ্রিকা মহাদেশ থেকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে সর্বত্র। সেই থেকে অভিগমন আর অভিবাসন নিরন্তর চলছে। কেবল কারণগুলি পাল্টে গেছে। সামন্তযুগে শাসকের সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান জনগোষ্ঠীগুলিকে বিস্থাপিত করেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনাকাল থেকেই কাঁচামাল-বাজার আর সস্তা শ্রমের প্রয়োগ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে, দেশ-মহাদেশ দখল করে, ক্রীতদাস বানিয়ে দেশ-জাতি-গোষ্ঠী-পরিবারকে ছিন্ন ভিন্ন করে এই প্রক্রিয়া জারি থেকেছে। পুঁজিবাদ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থারূপে বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির বন্ধনে আবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষ জীবিকার তাগিদে দেশ-দেশান্তরে গমন করেছে এবং করছে। বর্তমানে পুঁজিবাদের একচেটিয়া যুগে দখলদারীর প্রয়োজনে সৃষ্টি করা যুদ্ধ-বিশ্বযুদ্ধ, দেশ বিভাজন, দেশ দখল, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত দাঙ্গা-গণহত্যার শিকার হয়ে বিশ্বব্যাপী শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারীর তুফান উঠেছে। বাস্তব তথ্য এটাই প্রমাণ করে কোন ভূখন্ডের আদি অকৃত্রিম ভূমিপুত্র হিসাবে কেউ দাবি করতে পারে না।"

জানুয়ারি ২০২০ তে সর্বভারতীয় স্তরে ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশমঞ্চ এবং নানা ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-গণতান্ত্রিক সংগঠনের সাথে যৌথ প্রচার কর্মসূচীতে বিজ্ঞান মনস্ক সামিল হয়। প্রচারপত্র এবং পোস্টারিং রাজ্যের প্রায় সর্বত্র করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা, কুলতলি, দক্ষিণ বারাসত-গোচরণ-হোগলা অঞ্চল, লক্ষ্মীকান্তপুর, সোনারপুর, গঙ্গাজোয়ারা, আশুতি অঞ্চলে; উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ অঞ্চলে; পূর্ব বর্ধমানের নিমতলা-বিদ্যানগর অঞ্চলে; হাওড়ার আন্দুল অঞ্চলে কলকাতার বেহালা-ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল অঞ্চলে পথসভা-মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলগুলি ছাড়াও নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলী, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা জনতার মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত মতামত তুলে ধরেছেন। যৌথ প্রচারপত্রে বলা হয় "মনে রাখতে হবে এখন শুধু ভারতে নয় দুনিয়াজুড়ে চলছে 'বিদেশী' বিতাড়নের জিগির। এর প্রধান কারণ পুঁজিবাদ আজ অতি উৎপাদনের সংকটে গভীরভাবে নিমজ্জিত। সমস্ত পণ্যের মত শ্রমশক্তিও এখন উদ্বৃত্ত। তাই বেরোজগার শ্রমজীবীদের লড়িয়ে দিতে এই বিভাজনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। শ্রমজীবী জনতা চায় পুঁজিবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়তে আর শাসকশ্রেণী চায় তাকে ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করতে, এনআরসি-র নামে আতঙ্কগ্রস্ত করতে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যুগে দুনিয়া জুড়ে পুঁজির গতিবিধি অবাধ অথচ পুঁজির সাথে আবদ্ধ শ্রমজীবী জনতাকে তারা সীমানা-কাঁটাতার-ডিটেনশন ক্যাম্প নামক কারাগারে আটকে রাখতে চায়। শাসকশ্রেণী প্রচার করছে 'অনুপ্রবেশকারী'দের জন্য দেশের মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এই প্রচার অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই প্রচারের উদ্দেশ্য হল, কর্মহীনতার কারণ যে পুঁজিবাদ তাকে আড়াল করতে মানুষে মানুষে লড়িয়ে দেওয়া।

এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে আওয়াজ তুলুন ঃ *দেশবাসীকে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত করা বন্ধ কর! *নাগরিকত্বের নামে জনউৎপীড়ন বন্ধ কর! *দেশে বসবাসকারী সকল মানুষকে নাগরিক হিসাবে ঘোষণা কর! *প্রত্যেক নাগরিককে জীবিকার গ্যারান্টি দিতে হবে *কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

দক্ষিণ শহরতলী এনআরসি বিরোধী মঞ্চের অংশীদার সদস্য হিসাবে কলকাতা তথা দক্ষিণ শহরতলীর নানা অঞ্চলে এনআরসি-সিএএ-এনপিআর-এর বিরুদ্ধে কর্মসূচীতেও সংগঠন ধারাবাহিকভাবে সামিল ছিল। আতঙ্কগ্রস্থ এবং উৎপীড়িত (বিশেষ করে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের) জনতার নানা ধর্ণা-অবস্থান কর্মসূচী এবং মিছিলে আসানসোল-কলকাতা এবং মুর্শিদাবাদে আমরা সামিল হয়েছি। পুলিশের মদতে আন্দোলনকারীদের উপর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের হামলার

বিরুদ্ধে এনআরসি বিরোধী দক্ষিণ শহরতলী মঞ্চের ডাকে ১লা মার্চ প্রতিবাদ মিছিলে সংগঠন অংশ নিয়েছে।

বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক

প্রতিবছরের মত এবছরও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বইমেলায় বিজ্ঞান মনস্ক অংশগ্রহণ করে সংগঠনের নীতি আদর্শ প্রচার করেছে। প্রতিটি জেলাতেই জনসাধারণের সমীক্ষণ এবং in-sight সংগ্রহের আগ্রহ ছিল লক্ষ্য করার মত। জেলাওয়াড়ি বইমেলার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ ঃ

দার্জিলিঙ ঃ ৩০শে নভেম্বর – ৮ই ডিসেম্বর ২০১৯, দার্জিলিঙ জেলার শিলিগুড়ি শহরের কাঞ্চনজঙ্গা স্টেডিয়াম, উত্তরবঙ্গ বইমেলা।

হাওড়া ঃ ৭-১৪ই ডিসেম্বর ২০১৯, আমতা থানার রসপুরের দামোদর মেলা।

কলকাতা ঃ *১৩-২২শে ডিসেম্বর ২০১৯, বেহালা চৌরাস্তায়, বেহালা বইমেলা। *২-৪ জানুয়ারি ২০২০, কলেজ স্কোয়ার লিটল ম্যাগাজিন মেলা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ ৬-১৫ ডিসেম্বর ২০১৯, সোনারপুর বইমেলা।

পুরুলিয়া ঃ জেলা সদরের হিলভিউ মাঠে ২-৮ই জানুয়ারি ২০২০। * রঘুনাথপুর মহকুমা শহরের বিডিও অফিস মাঠে ২৭-২৯শে জানুয়ারি ২০২০ প্রথম বার্ষিকী বইমেলা।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ জেলা সদর আসানসোলে যুব শিল্পী সংসদ দ্বারা আয়োজিত ১০-১৯শে জানুয়ারি বইমেলা। এই মেলার মঞ্চে গত ১৮ই জানুয়ারি ২০২০ "প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিজ্ঞানের আলোকে তার প্রতিকার" শীর্ষক অডিও-ভিস্যুয়াল সেমিনার করা হয় স্থানীয় শাখার উদ্যোগে।

কোচবিহার ঃ গত ৭-৮ই মার্চ ২০২০, জেলা সদরে রাজবাড়ি উদ্যানে তোর্সা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন বইমেলা।

হাওড়া জেলার আমতা থানায় বিজ্ঞান মনস্ক আয়োজিত কৃষিমেলা

গত শীতের মরশুমের ন্যায় এই মরশুমেও গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০১৯ বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ-এর হাওড়া আমতা ইউনিটের পক্ষ থেকে জনসাধারণের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় কৃষিমেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কানপুর মা মনসা স্বেচ্ছাসেবক সমিতি'র ক্লাব প্রাঙ্গনের মাঠে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এলাকার প্রবীণ কৃষকেরা। ছোট এবং বড়দের 'বসে আঁক' দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ছবির বিষয় ছিল কৃষি ও কৃষক। এরপর দুপুরে শুরু হয় দূরদুরান্তের কৃষকদের ফসল প্রদর্শনী। মঞ্চে চলতে থাকে গ্রামবাসীদের দ্বারা উপস্থাপিত নানা আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং নৃত্য প্রদর্শনী। এরই মাঝে মাঝে একে একে প্রবীণ এবং নবীন কৃষকেরা বক্তব্য রাখেন। একজন প্রবীণ কৃষক বলেন "আমি কমলচক গ্রামের বাসিন্দা। আমার বয়স ৮০ বছর। কৃষক হিসাবে এই প্রথম সম্মান পেলাম। আমি বিগত ৬০-৬৫ বছর ধরে কৃষিকাজ করি কিন্তু আজও কৃষক হিসাবে সম্মান পেলাম না। কারণ আমরা বর্গাদার কৃষক। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে আমাদের জমির পূর্ণ দলিল-পরচা না থাকায় ক্ষতিপূরণ পাই না। আমরা বর্গাদার কৃষক বলে কৃষিঋণ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাই না, জমির মালিকরা পায়। তবে কি আমরা কৃষক নই? চাষের জন্য প্রয়োজন জল। অথচ খাল সংস্কার করে জল সেচের আজও ব্যবস্থা হল না। খরিদ্দাররা বলেন ফসলের এত দাম! অথচ সার, বীজ কীটনাশকের দাম আগুন হয়ে যাচ্ছে। সেচের খরচ ৫০ টাকার বদলে বিঘায় ৫০০ টাকা লাগে। ১০ মি. গ্রা ওষুধের দাম ১২০ টাকা হয়ে গেছে। দিন থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে নিজের ফসলের দাম পাই না। সরকার নাকি কৃষকদের অনেক সুবিধা দিচ্ছে! সেটা কারা পাচ্ছে গো! সব চুয়ায় খেয়ে নিচ্ছে, সাধারণ গরীব কৃষক তা পাচ্ছে না, প্রতিবাদ করতে গেলে আপনি শত্রু। কৃষকদের উন্নতির জন্য এই মেলা করার জন্য এবং সারাবছর কৃষকদের পাশে থাকার জন্য বিজ্ঞান মনস্ক'কে ধন্যবাদ।"

একজন নবীন প্রজন্মের কৃষক বলেন "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে অবশ্যই কৃষির বিরাট উন্নতি হয়েছে। আপনারা যে মাঠে বসে আছেন সেই মাঠের পাশের জমিতে একসময় আমার বাবা বিঘা প্রতি ধান ফলিয়েছেন ৬মণ, আর আজ আমি ধান ফলাচ্ছি ২১ মণ। এটা সম্ভব হয়েছে কৃষি বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগের জন্য। কিন্তু বিঘা প্রতি মাত্র ৬ মণ ধান ফলিয়ও আমার বাবা পাঁচটা মেয়ে এবং দুই ছেলেকে মানুষ করেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। আর আমি ২১ মণ ধান ফলিয়েও সংসার চালাতে পারছি না। কৃষকদের এখন যে পরিমাণ শোষণ হচ্ছে তা ভাই বিগত দিনে ব্রিটিশদের শোষণের চেয়েও বেশি। কৃষকরা অমানুষিক পরিশ্রম করেও শ্রমের দাম পাচ্ছেন না। আজ চারদিকে প্লাস্টিক দূষণ বাড়ছে। সরকার জনগণকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে বলছে কিন্তু প্লাস্টিক উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়। সরকার কিন্তু তা করবে না। একটু আগে একজন বক্তা জৈব সার ব্যবহার

কলকাতায় মিছিল

হাওড়ায় কৃষিমেলা

করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৃষকদের হয়ে আমি বলছি এক এক রকমের জৈব সারে এক এক রকম আগাছা তৈরি হয়। জৈব সারের দাম বেশি এবং তা ব্যবহারে জন্মানো আগাছা নির্মূল হয় না। কৃষকদের গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে দেশী-বিদেশী মালিকরা। জৈব-রাসায়নিক সব সার বিক্রি করে কোম্পানিগুলো মুনাফা লুটছে অথচ কৃষকের জীবন উন্নত হচ্ছে না। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা কোথায় এগিয়ে যাব, না পিছিয়ে যাচ্ছি। আজ সমগ্র কৃষক সমাজকে ভাবতে হবে কৃষির উন্নতি হলেও কৃষকের জীবনে উন্নতি হচ্ছে না কেন? কৃষকদের পরিশ্রম কারা ভোগ করছেন।"

গ্রামের একজন প্রবীণ শ্রমিক বলেন "আমাদের শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের মিলের দিকগুলো খুঁজে একতার জন্য ভাবতে হবে। দেশের যা কিছু সম্পদ সব সৃষ্টি করে শ্রমিক আর কৃষক। অথচ দেখুন এদের জীবনই কাটে সবচেয়ে কষ্টে। কেন এমন হয় তার উত্তর খুঁজে পেলেই শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির রাস্তা উন্মুক্ত হবে।"

গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, যিনি একজন কৃষকের সন্তান বলেন "আমি বিজ্ঞান মনস্ক'র সব অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীতে পাশে থাকার চেষ্টা করি। গ্রামীণ জনতার জীবনের উন্নতি ও বিকাশের জন্য এই সংগঠনের কার্যকলাপকে বাঁচিয়ে রাখা কর্তব্য। এই কৃষিমেলা সমস্ত প্রথাকে বদলে দিয়ে এক অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছে।"

বিজ্ঞান মনস্ক'র হাওড়া জেলার আমতা ইউনিটের সম্পাদক সভায় উপস্থিত সকল মানুষের কাছে সংগঠনের সামগ্রিক অনুশীলনের রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন "বিজ্ঞান মনস্ক তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি কৃষি বিজ্ঞানীদের সহায়তায় বছরে ২ বার কৃষকদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছে। আবারও একজন সাপে কাটা মানুষের মৃত্যুর পর তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা করেছে। জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য 'বিজ্ঞান ও কুসংস্কার' সেমিনার করেছে। ডাক্তারদের আন্দোলনের সময় 'ডাক্তার ও রোগী পরস্পর পরস্পরের শত্রু নয়' – চিকিৎসার সকল দায় সরকারকে নিতে হবে' এই দাবিতে প্রচার আন্দোলন করেছে। মার্চ ফর সায়েন্স বা বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রায় অংশ নিয়ে শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে। কৃষিমেলার মাধ্যমে কৃষক তথা গ্রামীণ শ্রমজীবী জনতাকে সম্মান জানানোর প্রয়াস রেখেছে।"

সন্ধ্যাবেলা কৃষি ও কৃষক তথা কৃষক আন্দোলন নিয়ে আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তরের আসর হয়। সবশেষে 'কৃষির উদ্ভব ও বিকাশ' নামক একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র দেখানো হয় পর্দায়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিজ্ঞান মনস্ক'র নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারি-বেসরকারি কোন সংস্থার আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের দ্বারাই করা হয়েছে। কৃষকদের সম্মানিত করা হয়েছে এবং প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : www.samikshan.com